- নবীন চিকিৎসকগণ নিজের জ্ঞান পরীক্ষা করুন
- চাপে প্রলোভনেও সোচ্চার জাফরুল্লাহ চৌধুরী
- উনিশ শতকে বাংলার অপরাধ জগৎ
- কফি পানকারীদের যকৃতের রোগ কম হয়
- শিশু-কিশোর বিভাগ

মাসিক

গণস্বাস্থ্য

৪০ বর্ষ ৭ম-৮ম সংখ্যা / কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৮

স্বচিকিৎসা : নিজের চিকিৎসা কিঞ্চিৎ নিজে করুন

বিশেষ ঘোষণা : ডায়ালাইসিস প্রতি সেসনের দর কমেছে

১লা বৈশাখ, ১৪২৮ (১৪ এপ্রিল, ২০২১) থেকে ধানমন্ডিস্থ গণস্বাস্থ্য ডায়ালাইসিস সেন্টারের সামাজিক শ্রেণীভিত্তিক বিভিন্ন চিকিৎসার পরিবর্তিত নতুন দর

নং	সামাজিক শ্রেণী	বর্হিঃ বিভাগের পরামর্শ ফি: Sr.GP	বর্হিঃ বিভাগের পরামর্শ ফি: বিশেষজ্ঞ	বর্হিঃ বিভাগের পরামর্শ ফি: Sr. বিশেষজ্ঞ	A-V Fistula চার্জ	ইমার্জেন্সী ক্যাথেটার স্থাপন	স্থায়ী ক্যাথেটার স্থাপন	নতুন বছর থেকে ডায়ালাইসিসে দর আরও কমলো — ডায়ালাইসিস ১-৩ শিফট (সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা): প্রতি সেসনে	১-৩ শিফট: সপ্তাহে তিনবার	৪র্থ শিফট (রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা): প্রতি সেসনে	৪র্থ শিফট: সপ্তাহে তিনবার	ইমার্জেন্সী প্রতি সেসনে	দৈনিক কেবলমাত্র সিট ভাড়া (ওষুধ ও ভিন্ন পরীক্ষার বিল আলাদা দিতে হবে): HDU Isolation	করোনা ওয়ার্ড	A/C কেবিন	ওয়ার্ড	পরীক্ষা ও ওষুধসহ দৈনিক ICU চার্জ	কিডনী বায়োপসী পরীক্ষা	কিডনীর USG	নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা, রক্তে শর্করা (RBS), ক্রিয়েটিনিন, এলবুমিন, কেলসিয়াম, হিমোগ্লোবিন প্রভৃতি	ব্লাড পরিসঞ্চালন (Transfusion)
১	অতি দরিদ্র	ফ্রি		১০০	১৫০০	৪০০০	৫০০০	৬০০	১৪০০	৪০০	১০০০	১০০০	৫০০	ফ্রি	পাবেন না	ফ্রি	৫০০০	২০০০	ফ্রি	ফ্রি	ফ্রি
২	দরিদ্র	১০০	২০০	৩০০	৫০০০	৬০০০	১৫,০০০	৮০০	১৮০০	৫০০	১২০০	১৫০০	১০০০	৫০০	পাবেন না	ফ্রি	১০০০০	৩০০০	২০০	৮০০	৪০০
৩	নিম্ন মধ্যবিত্ত	২০০	৩০০	৪০০	৭০০০	৮০০০	১৮,০০০	১০০০	২২০০	৬০০	১৫০০	২০০০	১৫০০	৮০০	পাবেন না	৩০০	১৫০০০	৪০০০	৪০০	১০০০	৪৫০
৪	মধ্যবিত্ত	৩০০	৪০০	৬০০	১০,০০০	১০,০০০	২১,০০০	১৩০০	৩৫০০	১০০০	২৫০০	২৫০০	২০০০	১২০০	৪০০০	৫০০	২০০০০	৫০০০	৫০০	১৫০০	৬০০
৫	উচ্চ মধ্যবিত্ত	৪০০	৬০০	৮০০	১২,০০০	১২,০০০	২৪,০০০	২০০০	৫০০০	১৫০০	৪০০০	৪০০০	৩০০০	১৫০০	৫০০০	৭০০	২৫০০০	৭০০০	৬০০	২০০০	৮০০
৬	ধনী	৫০০	৮০০	১০০০	১৪,০০০	১৪,০০০	২৬,০০০	২৫০০	৭০০০	২০০০	৫০০০	৫০০০	৪০০০	২৫০০	৬০০০	১০০০	৩০০০০	৮০০০	৭০০	২৫০০	৯০০
	গণ স্বাস্থ্যবীমা বিহীন	৬০০	১০০০	১২০০	১৬,০০০	১৬,০০০	২৮,০০০	২৫০০	৭০০০	২০০০	৫০০০	৬০০০	৫০০০	২৫০০	৭০০০	১২০০	৩৫০০০	১০০০০	৮০০	৩৫০০	১০০০

*** ICU/HDU/কেবিনে থেকে ডায়ালাইসিসের জন্য অতিরিক্ত ২০০০ টাকা যোগ হবে।**

কিডনী প্রতিস্থাপন (Transplant) উত্তম চিকিৎসা।

সামাজিক শ্রেণীভিত্তিক গণ স্বাস্থ্যবীমার একক এবং পারিবারিক দর

টঙ্গী, সাভার ও ঢাকা শহরে বসবাসকারীদের একক এবং বাৎসরিক প্রিমিয়াম

RT-PCR এবং এন্টিবডি পরীক্ষা

বাড়ি থেকে স্যাম্পল আনার জন্য অতিরিক্ত ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের অন্যান্য সেবা সমূহ উন্নতমানের কিন্তু খরচ আপনার সামর্থ্যের মধ্যে। বিভাগ সমূহঃ

* জেনারেল মেডিসিন * নেফ্রোলজী * কার্ডিওলজী * সাইকিয়াট্রিক মেডিসিন * জেনারেল সার্জারী * শিশু সার্জারী * শিশু ও নবজাতক * দন্ত বিভাগ * চক্ষু বিভাগ * নাক.কান.গলা * গাইনী এন্ড অবস * অর্থোপেডিকস * ফিজিওথেরাপী * আয়ূর্বেদ * আকপাংচার * চর্ম ও যৌন * ক্যান্সার বিভাগ * প্যাথলজী * ই.সি.জি. * ইকোকার্ডিওগ্রাফী * রেডিওলজী ও ইমেজিং বিভাগ * জেনারেল ও টি

হাসপাতালে ভর্তি ও ওষুধসহ প্যাকেজ চার্জের কয়েকটি উদাহরণ

নং	সামাজিক শ্রেণী	বাৎসরিক একক স্বাস্থ্যবীমা: অধূমপায়ী	বাৎসরিক একক স্বাস্থ্যবীমা: ধূমপায়ী	বাৎসরিক পারিবারিক স্বাস্থ্যবীমা: অধূমপায়ী	বাৎসরিক পারিবারিক স্বাস্থ্যবীমা: ধূমপায়ী	এন্টিবডি পরীক্ষা	PCR পরীক্ষা	IOL চার্জ	চোখের Phaco চার্জ	বড় অপারেশন	মাঝারী অপারেশন	ছোট অপারেশন	নরমাল ডেলিভারী	সিজারিয়ান অপারেশন	অর্থোপেডিক/ নিউরো সার্জারী (ইমপ্লান্ট আলাদা)	Digital X-Ray	USG	ECG	Color ECHO	বিভিন্ন প্রকার রক্ত, CSF, Scrology, Micorobiology প্রভৃতি	ফিজিও থেরাপী
										অপারেশন, এনাসথেসিয়া ও ওষুধসহ প্যাকেজ											
১	অতি দরিদ্র	১০০	১২৫	২০০	২৫০	১০০	৫০০	৫০০	পাবে না	৫০০০	২০০০	ফ্রি	ফ্রি	২০০০	ফ্রি-২০,০০০	১০০	৫০	২৫	১০০	৫০	২৫
২	দরিদ্র	২০০	২৫০	৫০০	৬০০	১৫০	৭০০	১৫০০	পাবে না	১০,০০০	৫০০০	১০০০	৫০০	৫০০০	৩০০-২৫,০০০	২৫০	১৫০	৫০	৪০০	১০০-২০০	৫০
৩	নিম্ন মধ্যবিত্ত	৫০০	৬০০	১৫০০	১৭০০	২০০	১০০০	২০০০	৭০০০	১৫,০০০	১০,০০০	২০০০	১৫০০	১০,০০০	৪০০-৪০,০০০	৪০০	৩০০	১৫০	৮০০	২০০-৫০০	২০০
৪	মধ্যবিত্ত	১০০০	১২০০	২৫০০	২৮০০	২৫০	১৮০০	৩০০০	৯০০০	২০,০০০	১৫,০০০	৩০০০	২০০০	১৫,০০০	৫০০-৫৫,০০০	৫০০	৫০০	২০০	১২০০	৩০০-৮০০	৩০০
৫	উচ্চ মধ্যবিত্ত	১৫০০	১৭০০	৩০০০	৩৫০০	৩০০	২০০০	৩২০০	১০,০০০	২৫,০০০	২০,০০০	৫০০০	২৫০০	১৮,০০০	৮০০-৬০,০০০	৫৫০	৬০০	৩০০	১৫০০	৪০০-৯০০	৪০০
৬	ধনী	২০০০	২২০০	৪০০০	৪২০০	৩৫০	২২৫০	৩৫০০	১১,০০০	৩০,০০০	২৫,০০০	৬০০০	৩৫০০	২০,০০০	১০০০-৮০,০০০	৬০০	৭০০	৪০০	২০০০	৫০০-১০০০	৫০০
	গণ স্বাস্থ্যবীমা বিহীন	-	-	-	-	৪০০	২২৫০	৪০০০	১২,০০০	৫০,০০০	৩০,০০০	৭০০০	৪০০০	২৫,০০০	১০০০-১,০০,০০০	৭০০	৮০০	৫০০	২৫০০	৮০০-১২০০	৬০০

সেবা বৃদ্ধির জন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে দান করুন।

বাজারের থ্রী-পিছের জগতে

মেসার্স নিউ সানরে এন্টারপ্রাইজ

একটি স্বনামধন্য নাম

M/S NEW SUNRAY ENTERPRISE

M/S. New Sunray Enterprise

Shop # 28/29, I.T.C Tower, 26/26/01
Ahasanullah Road, Nowab Bari
(Pukur Par), Islampur, Dhaka-1100

REGISTRATION NO. DA-490 ♦ 40 Year, 7-8 Issue, Kartik-Agrahayan 1428 (October-November 2021) ♦ MONTHLY GONOSHASTHAYA

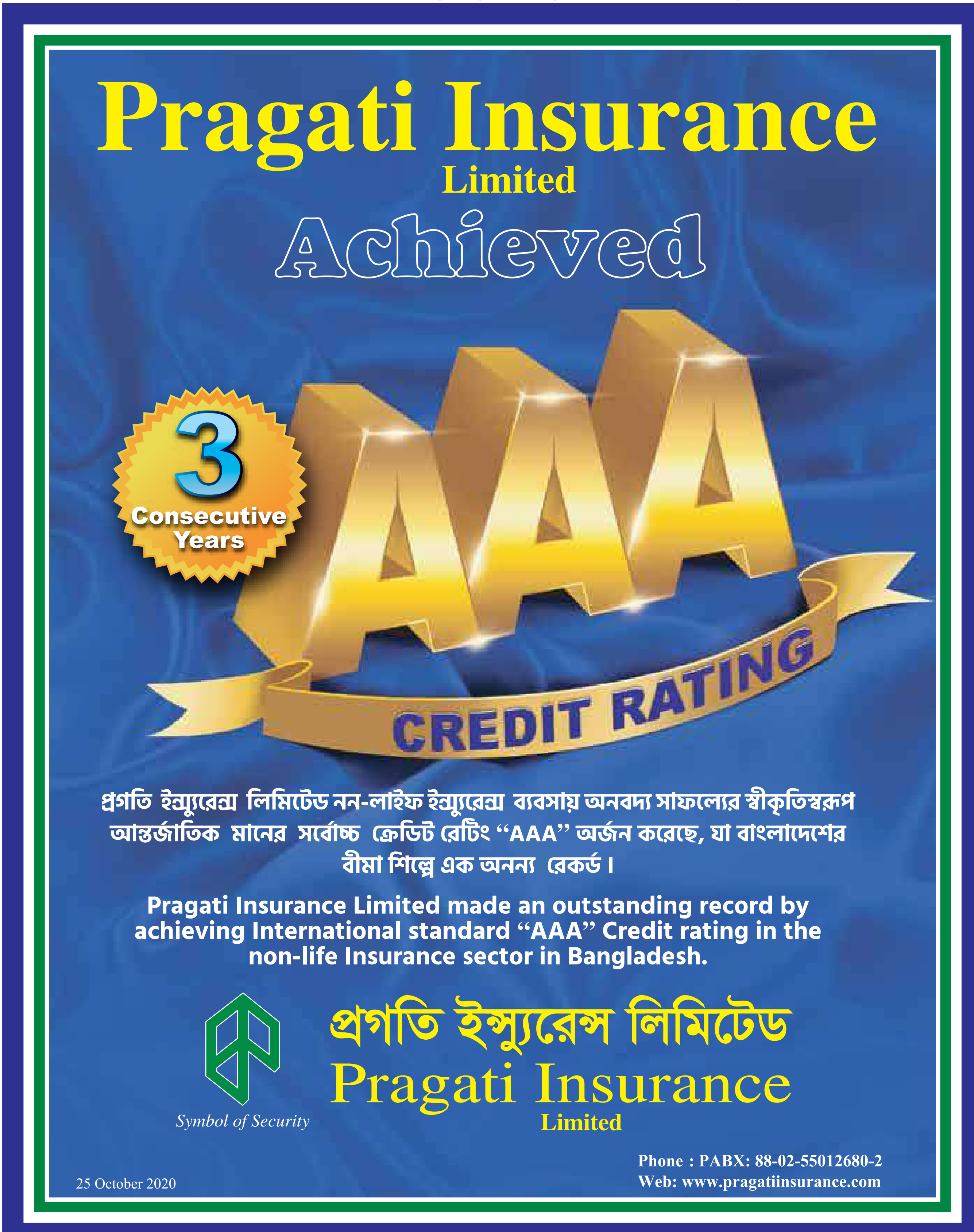

Published by Md. Zakaria from Gonoshasthaya Prokashana, Dhaka-1344 and Printed by him from Gonomudran Limited, Dhaka-1344
মোঃ জাকারিয়া কর্তৃক গণস্বাস্থ্য প্রকাশনা, ঢাকা-১৩৪৪ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক গণমুদ্রণ লিমিটেড, ঢাকা-১৩৪৪ থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ শিল্পী : মিতা মেহেদী

প্রতি কপির মূল্য : ১৫ টাকা

মাসিক

গণস্বাস্থ্য

প্রকাশনার ৪০ বছর ১৩৮৮-১৪২৮

Monthly Gonoshasthaya 40 Years of Publications 1388-1428

৪০ বর্ষ ৭ম-৮ম সংখ্যা / কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৮

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি
ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী

সম্পাদক
বজলুর রহিম

সম্পাদকীয় কার্যালয় :
মাসিক গণস্বাস্থ্য
শহীদ রফিক-জব্বার মহাসড়ক
পোঃ মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টনমেন্ট
ঢাকা-১৩৪৪, বাংলাদেশ

Chairman, Editorial Board
Dr. Zafrullah Chowdhury

Editor
Bazlur Rahim

EDITORIAL OFFICE :
Monthly Gonoshasthaya
Shahid Rafique-Jabbar Mahasarak
P.O. Mirzanagar via Savar Cantt.
Dhaka-1344, Bangladesh

Phone :
(880-2) 7791979, 7792331

E-mail :
gonoshasthaya.monthly@gmail.com

‘মাসিক গণস্বাস্থ্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাবলী পেশাদার চিকিৎসা পরিষেবার (Professional Medical Care) বিকল্প নয়। আমাদের মূল লক্ষ্য রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ে পাঠকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তৎসংক্রান্ত সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্য তুলে ধরা। কেবলমাত্র আপনার সংবেদনশীল চিকিৎসকই শারীরিক কোন সমস্যা বা রোগ নিরূপণ ও তার চিকিৎসা সঠিকভাবে করতে সক্ষম। নিজে নিজের চিকিৎসা করবেন না।

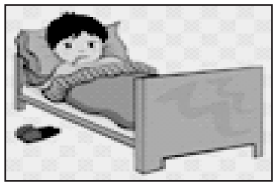

আধুনিক বিশ্বে কতরকম চিকিৎসা যে চালু আছে তার হিসাব মেলানো কঠিন। এলোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ থেকে আকুপাংচার, সম্মোহন থেকে সুগন্ধি চিকিৎসা – এমন আরো অনেক কিছুই আছে। অসুস্থ লোকজন যে একাধারে সব ধরনের চিকিৎসা নেন তা অবশ্য নয়; যে-যার বিশ্বাস মতো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। আর একদল আছেন – যারা পানিপড়া-তাবিজ বা পীরের দোয়ায় বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ কারো বিশ্বাস আধুনিক জমানার এলোপ্যাথি চিকিৎসায়, কেউ বিশ্বাস করেন হোমিওপ্যাথিতে আর একদল হয়ত আকুপাংচার পদ্ধতি বা অন্য কিছুতে সঁপে দেন নিজেকে। কবিরাজি বা শাস্ত্রীয় চিকিৎসার কথা বলাই বাহুল্য।

অসুস্থ হলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে সে-কথা সবাই জানেন। ষাট-সত্তর বছর আগে অসুস্থ শরীর নিয়ে ডাক্তার-বদ্যির কাছে যাবার আগে আমাদের দাদি-নানিদের হাতেই প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হয়ে যেত এবং তাতে যে তাঁরা দক্ষ ছিলেন সে-কথা অনেকেই জানেন এবং মানেন। অনেকের হয়ত মনে পড়বে যে, সর্দি-কাশি হলে বা বুকে কফ জমলে আমাদের দাদি-নানিরা সর্ষে তেলে আদা গরম করে সেই তেল গলা-বুকে-পিঠে-এবং হাত-পায়ের তালুতে মালিশ করতেন এবং তাতে রোগী যথেষ্ট আরাম বোধ করতেন। আধুনিক জমানায় কফ-কাশি দমিয়ে রাখার সিরাপ বা কফ-উক্ষেপকের রমরমা ব্যবসার দৌলতে সেই সাবেকি তেল-চিকিৎসা প্রায় হারিয়ে গেছে। প্রায় বলছি এজন্য যে, আমাদের গ্রাম-বাংলায় এই চিকিৎসা কৌশল হয়ত এখনও সীমিত পর্যায়ে টিকে আছে।

তো আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্ব এগিয়ে যাবে তাতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু কিছু কিছু কাজ ঘর থেকে শুরু হওয়াই উত্তম। অসুস্থ শরীর নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবার আগে ঘরেই যদি সে-কাজটা করা যায় তাহলে অর্থ-সাশ্রয়ের পাশাপাশি নিজের প্রতি দেখভালের দক্ষতা বাড়ে বই কমে না। নিজের দেখভাল করা মানেই শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি অধিকতর যত্নবান হওয়া। এসব বিষয় নিয়েই লেখা হয়েছে আমাদের এবারের প্রচ্ছদ রচনা ‘নিজের চিকিৎসা কিঞ্চিৎ নিজে করুন’। অবশ্য স্বচিকিৎসা তথা নিজের যত্ন নেবার চেষ্টা অনেকের ভেতরেই আছে, নেন-ও। আমরা চাই এ বিষয়ে আরো বেশি করে সচেতনতা আসুক আমাদের ভেতর। তাতে আপনার-আমার যেমন আর্থিক সাশ্রয় হবে, যানজটের এই দুর্বিষহ সময়ে চিকিৎসকের কাছে দৌড়াদৌড়ির পেরেশানিও কমবে।

করোনাময় এই সময়ে নিজে টিকা নিন, অন্যকেও টিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করুন এবং নিরাপদ থাকুন।

সূচীপত্র

বিশ্বস্বাস্থ্য ২
নবীন চিকিৎসকগণ নিজের জ্ঞান পরীক্ষা করুন ৬
এক রাখালের প্রতি একজন প্রধান বিচারপতির ওয়াদা / আরিফ মাহমুদ ৭
নৈতিকতার অধঃপতনের যাত্রায় কতিপয় ‘নমস্য’ শিক্ষাবিদের ভূমিকা / সা কা ম আনিছুর রহমান খান কামাল ৯
প্রচ্ছদ রচনা / স্বচিকিৎসা : নিজের চিকিৎসা কিঞ্চিৎ নিজে করুন / গৌতম মিস্ত্রি ১১
সাক্ষাৎকার / চাপে প্রলোভনেও সোচ্চার জাফরুল্লাহ চৌধুরী / এনাম আবেদীন ১৯
ইসলামের ক্রমবিকাশে নারী চিকিৎসক / শান্তা আনোয়ার ২৩
তুরস্কের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের গড়ে তোলা এক অনন্য লাইব্রেরি ২৫
করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চক্র / সুজয় কুমার দাস ২৬
ভেন্টিলেটর কাহিনি – একজন নার্সের লেখা থেকে ২৯
ধারাবাহিক / মশা থেকে সৃষ্ট ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ও অন্যান্য অসুস্থতা ৩১
মানবদেহ সম্পর্কে বিস্ময়কর নানা তথ্য / রঞ্জন দাস রায় ৩৭
শিশু-কিশোর বিভাগ / গ্রন্থনা : ড. আমানুল ইসলাম ৪০
উনিশ শতকের বাংলার অপরাধ জগৎ / মাহমুদুর রহমান ৪২
মূত্রাশয় প্রদাহ : কীভাবে ব্যাকটেরিয়া মূত্রাশয়ে প্রবেশ করে / জান্নাতুল ফিজা ৪৫

আজীবন গ্রাহক চাঁদা : বাংলাদেশে : ৫,০০০.০০ টাকা ♦ ভারতে : ভারতীয় মুদ্রায় ৩,০০০.০০ রুপি, বাংলাদেশী মুদ্রায় ৮,০০০.০০ টাকা
বাংলাদেশে পাঁচ বৎসরের গ্রাহক চাঁদা : ১,০০০.০০ টাকা ♦ তিন বৎসরের গ্রাহক চাঁদা : ৬৫০.০০ টাকা ♦ বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা : ২৫০.০০ টাকা
[পত্রিকার সকল শ্রেণীর গ্রাহক চাঁদার সঙ্গে ডাক খরচ অন্তর্ভুক্ত]

মোঃ জাকারিয়া কর্তৃক গণস্বাস্থ্য প্রকাশনা, ঢাকা-১৩৪৪ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক গণমুদ্রণ লিমিটেড, ঢাকা-১৩৪৪ থেকে মুদ্রিত

প্রতি কপির মূল্য : ১৫.০০ টাকা

বি শ্ব স্বা স্থ্য

বিশ্বের নানা দেশে প্রকাশিত বিভিন্ন চিকিৎসা সাময়িকী ও দৈনিক সংবাদপত্র থেকে সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবাদ, চিকিৎসা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত নতুন গবেষণা সংবাদ, রোগ-তথ্য, ওষুধের খবর, চিকিৎসাসংক্রান্ত নতুন উদ্ভাবন ও অন্যান্য সংবাদ এই বিভাগের জন্য চয়ন করা হয়েছে।

বিম্বিকা (Pemphigus Vulgaris) রোগ নিরাময়ে রিটুক্সিম্যাব (Rituximab) অধিকতর কার্যকর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিল-ভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চর্মবিভাগে ৬২ জন বিম্বিকা (Pemphigus Vulgaris - বড় বড় ফোস্কার মত চর্মরোগ বিশেষ) রোগীকে রিটুক্সিম্যাব এবং একই সমস্যাক্রান্ত ৬৩ জন রোগীকে মাইকোফিনোলেট মেফেটিল (Mycophenolate Mofetil) দিয়ে এক বৎসর গবেষণায় দেখা গেছে, রিটুক্সিম্যাব গ্রুপে ৬ জনের এবং মাইকোফিনোলেট গ্রুপে ৪৪ জনের রোগ বেড়ে গেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিম্বিকা (Pemphigus Vulgaris)-এর চিকিৎসায় রিটুক্সিম্যাব অধিকতর কার্যকর।

British Medical Journal, 17 June 2021

তঞ্চাভিবাসন (Thromboembolism) প্রতিরোধে এবেলাসিম্যাব (Abelacimab) অধিকতর কার্যকর

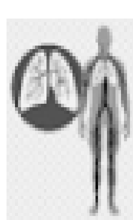

হাঁটু প্রতিস্থাপনোত্তর (Knee Arthroplasty) কালে রক্তের ঘনত্ব বেড়ে তঞ্চাভিবাসন (Thromboembolism) সৃষ্টি প্রতিহত করার জন্য ত্বকের নীচে ৪০ মিলিগ্রাম এনোক্সিপারিন দেয়া হয়। এনোক্সিপারিনের পরিবর্তে মনোক্লোনাল এন্টিবডি এবেলাসিম্যাব ১০২ জন রোগীকে বিভিন্ন মাত্রায় দিয়ে বিভিন্ন দেশে মাল্টিসেন্টার গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১৫০ মিলিগ্রাম এনোক্সিপারিনের তুলনায় এবেলাসিম্যাব অধিকতর কার্যকর। তবে ৩০ মিলিগ্রাম এবেলাসিম্যাব (Abelacimab) এনোক্সিপারিনের তুলনায় অধিকতর কার্যকর নয়।

British Medical Journal, 17 June 2021

ওষুধের অতিরিক্ত মূল্য ধার্য্য করায় ২৬০ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড জরিমানা

ব্রিটেনের বাজার ও প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষ (Competition and Markets Authority) অডেন ম্যাকেঞ্জি ওষুধ কোম্পানিকে এপ্রিল ২০০৮ সন থেকে ক্রমান্বয়ে ২ মার্চ ২০১৬ সন অবধি ধাপে ধাপে ১০ মিলিগ্রাম হাইড্রোকরটিসোন টেবলেটের বিক্রয় মূল্য ৭০ পেন্স থেকে বাড়িয়ে ৮৮ পাউন্ড (৮,৮০০ টাকা) দরে এবং ২০ মিলিগ্রামের হাইড্রোকরটিসোনের বিক্রয় মূল্য ১.০৭ স্টার্লিং ব্রিটিশ পাউন্ড থেকে বাড়িয়ে ১০২.৭৪ ব্রিটিশ পাউন্ডে বিক্রয় করে ব্রিটিশ ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসকে প্রতারণা করায় ২৬০ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড (২,৬০০ কোটি টাকা) জরিমানা করেছে। তদন্তে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, অভিযুক্ত কোম্পানি চক্রান্ত করে তার প্রতিযোগী কোম্পানিকে হাইড্রোকরটিসোন (Hydrocortisone) টেবলেট উৎপাদন থেকে রহিত করেছে এবং উৎপাদন খরচ এক ব্রিটিশ পাউন্ডের কম হলেও অতিরিক্ত মুনাফার জন্য ১০০ পাউন্ডের বেশি বিক্রয় মূল্য ধার্য্য করে ব্রিটিশ ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ক্ষতিসাধন করেছে।

British Medical Journal, 24-31 July 2021

টিকা না-নেয়া গর্ভবতী নারীরা কোভিড-১৯ ভাইরাসে বেশি আক্রান্ত হন

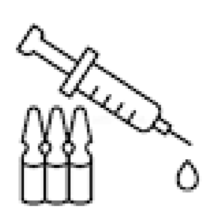

যে সকল গর্ভবতী করোনা টিকা নেননি, তারা অধিকতর কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হন। তারা ৪৫% ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হন। বিগত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই ২০২১ পর্যন্ত এ জাতীয় ৭৪২ জন গর্ভবতী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে মাত্র ৪ জন গর্ভবতী প্রথম ডোজ টিকা নিয়েছিলেন। কেউ দ্বিতীয় ডোজ নেননি।

British Medical Journal, 7-14 August 2021

থাইরয়েড রোগের ওষুধের অতিরিক্ত মূল্য ধার্য্যের কারণে ওষুধ কোম্পানির ১০০ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড জরিমানা

থাইরয়েড রোগে ব্যবহৃত লিউথাইরোনিন (Liothy-ronin) টেবলেটের মূল্য বাড়িয়ে ২০১৬ সনে ব্রিটিশ ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস থেকে ৩০ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড অতিরিক্ত চার্জ করার জন্য এডভান্স ওষুধ কোম্পানিকে ১০০ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড (১০০০ কোটি টাকা) জরিমানা করা হয়েছে।

British Medical Journal, 7-14 August 2021

দৈনিক একটি আপেল ডায়াবেটিস থেকে দূরে রাখতে সহায়ক

গত ৮ জুলাই ২০২১ এ ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালের অনলাইনে প্রকাশিত গবেষণা-তথ্য অনুযায়ী ফল ও সবজি পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ টাইপ-২ ডায়াবেটিস থেকে দূরে রাখতে সহায়তা করে। আটটি ইউরোপীয় দেশের ৩৪০,০০০ মানুষের মধ্যে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ব্যাপ্ত নতুন করে ডায়াবেটিস শনাক্ত হয়েছে এমন নয় হাজার সাতশত চুয়ান্নজন অংশগ্রহণকারীদের সাথে উক্ত সময় ধরে ডায়াবেটিসমুক্ত আছেন এমন তের হাজার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গবেষকরা ফল ও শাকসবজি গ্রহণের তুলনামূলক গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষকরা সাতটি মুখ্য উদ্ভিদজাত পুষ্টি উপাদান যেমন ভিটামিন সি ও ক্যারোটিন হিসেবে পরিচিত টকটকে বর্ণের জারকরোধী (Antioxident) পিগমেন্টজনিত রক্তের স্তর গণনা করেন। গবেষণা সময়ে যারা উক্ত ধরনের খাদ্যসামগ্রী বা পুষ্টি উপাদান অল্প পরিমাণে গ্রহণ করেছে তাদের তুলনায় উচ্চ মাত্রায় ফল ও সবজি গ্রহণকারী এবং উদ্ভিদজাত পুষ্টি উপাদানের উচ্চ রক্ত স্তরযুক্ত মানুষের ডায়াবেটিস থাকার সম্ভাবনা শতকরা ২৫ থেকে ৫০ ভাগ কম। দৈনিক মাঝারি আকৃতির একটি আপেলের কেবল দুই- তৃতীয়াংশ বা কাপের এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন ফলের মিশ্রণ সমপরিমাণ সুরক্ষা প্রদান করে।

Harvard Health Letter, October 2020

কম সর্দি লাগা, ফুসফুসের গোলযোগের সাথে ভিটামিন এ, ই, ও ডি-এর সম্পর্ক রয়েছে

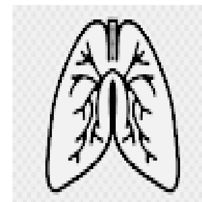

আহারের মাধ্যমে (বা প্রয়োজনে মাল্টিভিটামিন সেবন) পর্যাপ্ত ভিটামিন গ্রহণ হচ্ছে অনাক্রম্যতন্ত্র (Immune system) শক্তিশালী করার অন্যতম একটি পন্থা। জেনে হয়তো অবাক হবেন যে, ভিটামিন সর্দি ও অন্যান্য শ্বাসতান্ত্রিক সমস্যাকে দূরে রাখতে পারে। *ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল*-এর নিউট্রিশন প্রিভেনশন এন্ড হেলথ-এ গত ২৭ অক্টোবর ২০২০ প্রকাশিত এক পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় গবেষকরা আট বছর ধরে ছয় হাজারেরও অধিক ব্রিটিশ পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্বনথিবদ্ধ আহারের তথ্য মূল্যায়ন করে দেখেছেন। নথিবদ্ধ যেসব মানুষ আহার ও সম্পূরক (Supplement) উভয় হতে ভিটামিন এ এবং ই সর্বোচ্চ পরিমাণে এবং শুধুমাত্র সম্পূরক হতে ভিটামিন ডি সর্বোচ্চ গ্রহণ করেছেন, তাদের শ্বাসতান্ত্রিক অসুস্থতা যেমন সর্দি, হাঁপানি, ও ক্রোনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি রোগের (COPD) কম অভিযোগ পাওয়া গেছে। গবেষণাটি থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, ভিটামিন শ্বাসতান্ত্রিক সমস্যাকে প্রতিরোধ করেছে, কিন্তু অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে শ্বাসতান্ত্রিক রোগের নিম্ন ঝুঁকির সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। আহারের মাধ্যমে ভিটামিন পাওয়া গেলে তা সবচেয়ে কার্যকরী। ভিটামিন এ-এর উৎকৃষ্ট উৎস হচ্ছে: পূর্ণ ননীযুক্ত দুধ, পনির, গাজর ও কালচে পত্রময় সবুজ শাক। ভিটামিন ই-এর উৎকৃষ্ট উৎস হচ্ছে উদ্ভিজ্জ তেল, বাদাম ও বীজ। খাবার হতে পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি প্রাপ্তি কষ্টসাধ্য, (যেমন মাছ কিংবা ফর্টিফাইড দুধ), তাই ১০০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট পরিমাণ ভিটামিন-ডি৩ কিছুটা সুবিধা প্রদান করতে পারে।

Harvard Health Letter, January 2021

নষ্ট হওয়া ঘুম কি সপ্তাহান্তিক অবকাশে পূরণ করা যায়?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন রাতের বেলায় বিশেষজ্ঞ সুপারিশকৃত সাত ঘন্টা সময়ের চেয়ে কম ঘুমান। আপনি এর মধ্যে থাকলে কটিরেখা ও স্বাস্থ্য নিয়ে বিপত্তিতে আছেন।

ইউনিভার্সিটি অব উটাহ-এর হেলথ এন্ড কাইনসিওলজির সহকারী অধ্যাপক ক্রিস্টোফার ডেপনার (Christopher Depner) বলছেন, অধিকাংশ গবেষণায় দেখা গেছে যেসব মানুষের খাবারের

অপার সুযোগ আছে, তাদের কম ঘুম ও খাদ্যগ্রহণ অধিক হলে ওজন বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ঘুমের জন্য নিয়োজিত ২২৫ জন স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে যারা পরপর পাঁচ রাত অনধিক চার ঘন্টা ঘুমিয়েছেন তারা দুই পাউন্ড ওজন বেড়েছে। অপরদিকে যারা রাতে দশঘন্টা পর্যন্ত ঘুমান তাদের কোন ওজন বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু অপর্যাপ্ত ঘুমে অতিরিক্ত ওজন অর্জনই একমাত্র মন্দ দিক নয়। গবেষণাগার নিয়ন্ত্রিত ট্রায়ালগুলোতে নিয়ন্ত্রিত ঘুমে ইনসুলিন সংবেদনশীলতায় ধারাবাহিক হ্রাস পাওয়া প্রদর্শন করে। এমনকি স্বাস্থ্যবান তরুণ যাদের অতিরিক্ত খাওয়ার সুযোগ নেই, তারা নিয়ন্ত্রিত ঘুমেও ইনসুলিন সংবেদনশীলতায় পড়তে পারেন।

ইনসুলিন সংবেদনশীলতা হ্রাস পাওয়া বলতে বোঝায় শরীরের ইনসুলিন কোষের ভিতরে রক্তের সুগারকে সঞ্চরমান করতে কম সক্ষম। ইনসুলিন একবার তার পর্যাপ্ত শক্তি হারালে রক্তের সুগার বৃদ্ধি পায় এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস হবে।

অধ্যাপক ডেপনার বলছেন, আমাদের ইনুসলিন সংবেদনশী-লতা টেষ্ট, পরিবর্তন শনাক্ত করতে পারে। যা চিকিৎসকের কাছে খাবার পরেও দৃশ্যমান হয় না। তিনি বলছেন, অভুক্ত রক্তের সুগারের ঊর্ধ্বগতি চিকিৎসককে আপনার প্রিডায়াবেটিস বিষয়ে সতর্ক করে। ডেপনারের গবেষণা একটি মুখ্য প্রশ্নকে সামনে এনেছে : 'অধিকাংশ মানুষ সপ্তাহান্তে বিনষ্ট ঘুমকে পাকড়াও করার চেষ্টা করেন, তাই সপ্তাহান্তে পুনরুদ্ধার ঘুম বিপাকীয় স্বাস্থ্যে কোন সুফল আনয়ন করে কিনা তা আমরা দেখতে চেয়েছি।'

তাঁর দল ৩৬ জন শীর্ণ তরুণ তরুণীকে যাদৃচ্ছিকভাবে (Randomly) তিনটি শ্রেণির একটিতে অন্তর্ভুক্ত করেন।

অধ্যাপক ডেপনার বলছেন, একটি শ্রেণির ছদ্মকৃত কর্মসপ্তাহ-জনিত অপর্যাপ্ত ঘুম ছিল। তাদের সোমবার থেকে শুক্রবার প্রতি রাতে পাঁচঘন্টা ঘুমে সীমাবদ্ধ করা হয়। এরপর তারা ছদ্মকৃত সপ্তাহান্তে চাহিদামত ঘুম দেন। এরপর তারা আবার দুইদিনের জন্য অপর্যাপ্ত ঘুমে প্রত্যাবর্তন করেন।

অন্য আরেকটি শ্রেণিকে উক্ত নয় রাতের জন্য শুধুমাত্র পাঁচঘন্টা ঘুমের সুযোগ দেয়া হয়। আর তৃতীয় শ্রেণিকে রাতে নয় ঘন্টা পর্যন্ত ঘুমের সুযোগ দেয়া হয়।

ফলাফলে দেখা যায় সপ্তাহান্তের পুনরুদ্ধার ঘুম ওজন অর্জনকে বা বিকল ইনসুলিন সংবেদনশীলতাকে রোধ করতে পারেনি।

আপনি যদি বারবার চক্রে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কর্মসপ্তাহে অপর্যাপ্ত ঘুম ও সপ্তাহান্তে পুনরুদ্ধার ঘুমের সামনে থাকেন, তা ওজন বৃদ্ধি বা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দিতে পারে না। তাই উত্তম পরামর্শ হচ্ছে কর্মসপ্তাহ সময়কালীন পর্যাপ্ত ঘুমানো।

অধ্যাপক ডেপনার বয়স্ক মানুষের উপরও কিছু গবেষণা পরিচালনা করেছেন। তাতে দেখা যায় বয়স্কদের মধ্যে যাদের প্রাক-ডায়াবেটিস, বাড়তি ওজন, বা টাইপ ২ ডায়াবেটিসের অন্যান্য ঝুঁকি নিয়ামক রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কী হবে তা নির্ধারণ করা যায়নি।

Nutrition Action Health Letter, March 2021

হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে পারে ১২ মিনিটের ব্যায়াম

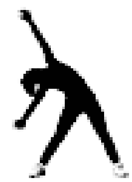

কখনো কি ভেবে দেখেছেন কী পরিমাণ ব্যায়াম-সময় হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে? গত ১৭ নভেম্বর ২০২০-এ *Circulation* পত্রিকায় প্রকাশিত হার্ভার্ড-এর এক গবেষণা অনুযায়ী এটি ১২ মিনিটের মতো স্বল্প সময়। গবেষকরা ৪০০-এর অধিক মধ্য বয়স্ক পুরুষ ও মহিলার সাইক্লিং যন্ত্রে ১২ মিনিটের পেডেল মারার পূর্বে ও পেডেল মারার অব্যবহিত পরের রক্ত বিশ্লেষণ করেছেন। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, বিজ্ঞানীরা প্রায় ৬০০ প্রাকৃতিক দৈহিক রাসায়নিক (মেটাবো-লাইটস)-এর স্তর গণনা করেন। অধিকাংশ মেটাবোলাইটসে ব্যায়ামের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, একটি মেটাবোলাইটের স্তর হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস ২৯% হ্রাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্য আরেকটি মেটাবোলাইট ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ও যৃকত রোগ ১৮% কমানোর সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু ১২ মিনিটের দৈনিক ব্যায়াম (যাতে তেজস্বি সক্রিয়তা অন্তর্ভুক্ত) যে হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে তার ইঙ্গিত দেয় কিন্তু প্রমাণ করে না। কী ঘটবে যদি আপনি পরিমিত তীব্রতার কিছু অধিক মাত্রার ব্যায়ামবিদ হন? হার্ভার্ড-এর ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও গবেষণা প্রতিবেদনের জ্যেষ্ঠ লেখক ডা. গ্রেগরি লুইস (Gregory Lewis) বলছেন, পরিমিত তীব্রতার মাত্রার ব্যায়াম, মেটাবোলাইটের উপর একই ধরনের প্রভাব প্রদর্শন করে কিনা তা আমাদের এখনো অজানা। কিন্তু গবেষণার অংশগ্রহণকারীরা খুব লঘু ব্যায়াম দিয়ে শুরু করেছিলেন এবং প্রতি মিনিটে তীব্রতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

Harvard Health Letter, February 2021

কফি পানকারীদের যকৃতের রোগ কম হয়

যে সকল ব্যক্তি যে কোনো ধরনের কফি (ক্যাফেইনমুক্ত, ক্যাফেইযুক্ত, গ্রাউন্ড অথবা ইনস্টান্ট) পান করেন, তারা যকৃতের রোগে কম আক্রান্ত হন। ব্রিটেনে ৪৯৪,০০০ ব্যক্তির ওপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্য জানা গেছে। এবং ইতিমধ্যে যারা যকৃতের রোগে আক্রান্ত, তারা

কফি পান করলে রোগের অগ্রগতি ধীর হয়ে যায়। যকৃতে কফির এই সুরক্ষাদায়ী উপকারিতার কথা বিজ্ঞানীদের আগে থেকেই জানা থাকলেও নতুন এই সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সব ধরনের কফি থেকেই এই সুরক্ষা পাওয়া যায়।

Better Nutrition, September 2021

কোভিড-১৯ এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য

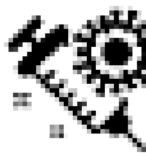

কোভিড-১৯ স্নায়ুগত (Neurological) এবং মনোবিদ্যাগত (Psychiatric) প্রায় ১২টি ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

বিজ্ঞানীরা কোভিড-১৯ আক্রান্ত হবার পর ২৩৬,০০০-এর অধিক ব্যক্তির ওপর ছয় মাস ধরে নজরদারি চালান। এই সময়ের মধ্যে এদের ১৩%-এর মধ্যে নতুন স্নায়ুগত অথবা মনোবিদ্যাগত সমস্যা নিরূপিত হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যেসকল ব্যক্তি ছয় মাস আগে ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাদের সাথে তুলনা করে দেখা যায় কোভিড-১৯ রোগীরা ফ্লু রোগীদের চাইতে দ্বিগুণ হারে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের (Brain bleed) শিকার হন (রক্তপাতি সন্ন্যাস সহ)। অন্য আরো যেসব সমস্যা দেখা দেয় তার মধ্যে আছে রক্তপাতবিহীন সন্ন্যাস (Non-hemorrhagic stroke), স্মৃতিভ্রংশ (Dementia), ঘুমহীনতা (Insomnia) অথবা এক ধরনের বাতুলতাধর্মী বৈকল্য (Psychotic disorder)।

এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কোভিড থেকে সুরক্ষমূলক টিকা নিন। উপরোক্ত সমস্যাগুলি কোভিড-১৯ এর কারণেই ঘটছে তা নিশ্চিভাবে প্রমাণিত নয়। কিন্তু টিকা না-নিয়ে নিজেকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেবেন কেন?

Lancet Psychiatry,
2021.doi-10:1016/s2215-0366(21)00084-5

জানেন কি যে...

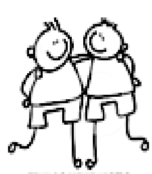

... বন্ধু-সংশ্লিষ্টতা মস্তিষ্কের জন্য ভাল? ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ পরিচালিত এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, যে সকল বয়স্ক প্রাপ্তবয়সী-রা সামাজিকভাবে সক্রিয় তারা এক্ষত্রে কম সক্রিয় ব্যক্তিদের তুলনায় অধিকতর স্বাস্থ্যবান মস্তিষ্কের অধিকারী। সমীক্ষায় বলা হয় – সামাজিকতায় আগ্রহী ব্যক্তিরা সাপ্তাহিক প্রার্থনা সমাবেশে অংশ নেন, অন্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন এবং এমনকি খেলাধুলায় নিজেদের ব্যস্ত রাখেন। কোভিড-১৯ থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে অনেকের ঘরে কাটলেও ভার্চুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমে এই আত্মিক যোগাযোগ রক্ষাও মস্তিষ্কে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

Journals of Gerontology, Psychological Sciences,
19 October 2020

... প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সন্ন্যাস (Stroke)-এর গুরুতর লক্ষণ বুঝতে পারেন না? লক্ষণ না-বুঝতে পারার ফলে তারা জরুরি চিকিৎসা সহায়তা নেবার চেষ্টাও করেন না। সন্ন্যাস-এর গুরুতর পাঁচটি লক্ষণ হচ্ছে : মুখ, বাহু অথবা পায়ের আকস্মিক অসাড়তা (Numbness) বা দুর্বলতা, বিশেষ করে এক পাশে; বিভ্রান্তি (Confusion) বা কথা বলতে সমস্যা; দেখতে সমস্যা; হাঁটতে অসুবিধা বোধ করা; ঘুম ঘুম ভাব (Dizziness) বা ভারসাম্য হারানো (Loss of balance); এবং তীব্র মাথাব্যথা।

Morbidity & Mortality, Weekly Report,
6 November 2020

১০০

...পৃথিবীজুড়ে ৫০০,০০০ মানুষ আছেন যাদের বয়স ১০০-এর ওপরে। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্টে শতবর্ষী মানুষের সংখ্যা সবচাইতে বেশি–৯৭,০০০।

...কোন দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষাতেই প্রমাণিত হয়নি যে, চিনি স্বয়ং বিষাক্ত বা কতক রোগের কারণ? অবশ্য ফলমূল, সবজি এবং পূর্ণ দানাদার শস্য (Whole grain)-এর পরিবর্তে চিনিযুক্ত, উচ্চ চর্বিময় খাবার থেকে প্রয়োজনীয় ক্যালোরি গ্রহণ স্বাস্থ্যসম্মত জীবনের জন্য উত্তম বিনিয়োগ নয়।

Source: *Environmental Nutrition.*

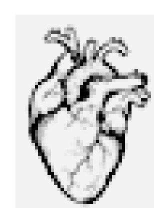

...হৃদরোগে আক্রান্ত হবার আগে নারী-পুরুষ উভয়েরই বুকে ব্যথা হয়? উভয় দলই অবসাদ (Fatigue), বাম বাহু অথবা ঘাড়ে ব্যথা, বমিভাব (Nausea), নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া (Breathlessness), ঘেমে যাওয়া (Sweating), অজ্ঞান হয়ে যাওয়া (Fainting) এবং অজীর্ণতা (Indigestion)-এর কথা বলেছেন। অন্যদিকে, অধিক সংখ্যক মহিলা চোয়াল, গলা এবং ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা বা ধুকপুকানির (Palpitation)-এর কথা উল্লেখ করেছেন।

Journal of the American Heart Association, 4 May 2020

নবীন চিকিৎসকগণ নিজের জ্ঞান পরীক্ষা করুন

দম খাটোযুক্ত এক তরুণ : A young man with shortness of breath

৩০ বছর বয়সের এক ব্যক্তি তিন সপ্তাহের বুকে ব্যথা (শ্বাসগ্রহণের সময় অধিকতর খারাপ হয়), কাশি, দম খাটো এবং বাম কুঁচকি (Groin)-তে অস্বস্তির ইতিহাস নিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের শরণাপন্ন হলেন। ছয় সপ্তাহ পূর্বে তার ডান উর্বস্থি শিরা (Femoral vein)-তে গভীর শিরা তঞ্চনরোধ (Deep vein thrombosis) ও বাম পায়ে কোষপ্রদাহ (Cellulitis–রক্ত প্রবাহে সম্পূর্ণ সংবেদনশীল *Staphylococcus aureus* ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি) নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ছাড়পত্র গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল, কিন্তু ছাড়পত্র নেয়ার সময় তার তঞ্চনরোধ (Anticoagulation)-এর কোন সমস্যা ছিল না। তিনি বিগত দুই মাসে পাঁচ কেজি ওজন হারানোর কথা জানিয়েছেন। উক্ত ব্যক্তি স্বীকার করেন যে, তিনি ইনজেকশন মারফত হিরোইন মাদক গ্রহণ করেন এবং সাম্প্রতিক সময়ে উভয় কুঁচকি ইনজেকশন গ্রহণের স্থান হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। যদিও তিনি বলেছেন, পূর্বে অন্যান্য শিরাগুলো ইনজেকশন প্রদানের জন্য ব্যবহার করতেন। তিনি জানিয়েছেন, ১৪ বছর যাবৎ তিনি প্রতি সপ্তাহে ১৫০ গ্রাম পরিমাণের তামাক সেবন করছেন।

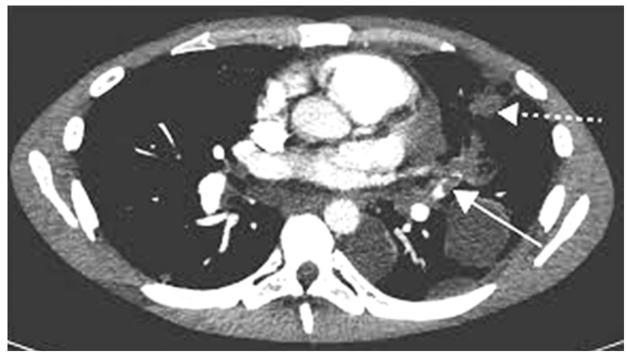

Fig-1: Computed tomography pulmonary angiogram in axial view showing left lower lobe lateral segmental pulmonary artery filling defect (white arrow). Broken white arrow shows multiple round areas of consolidation.

Relevant Blood test results

Test	Result	Normal range
White cell count	21.3 x 10^9/L	3.6-11.0 x 10^9/L
Neutrophils	10.1 x 10^9/L	2.0-7.5 x 10^9/L
Creactive protein	203 mg/L	<10 mg/L

Fig-2: Computed tomography angiogram of the inguinal region in axial view at the level of the orogin of the superficial femoral artery. Contiguous vessels and contrast (white arrow) and (black arrow) are seen. Dilated enhancing left iliac veins (much larger than those on the right) can also be seen (broken black arrow).

পরীক্ষা নিরীক্ষায় তাকে সজাগ (Alert) দেখা গেছে, তার দেহের তাপমাত্রা ছিলো ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কক্ষ বায়ুতে অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৯৯%, শ্বসন হার ৩৬ স্পন্দন/মিনিট, স্পন্দন হার ৯১ স্পন্দন /মিনিট, এবং রক্ত চাপ ৯৮/৬৪ পরিলক্ষিত হয়েছে। তার স্পষ্টত কোনো লসিকাগ্রন্থিবিকার (Lymphadenopathy) ধরা পড়েনি এবং কোন বাড়তি হৃদস্পন্দনও ছিল না। বুকের বাম দিকে বায়ু প্রবেশ ও নিস্তেজ আওয়াজ হ্রাস পেয়েছে। বাম কুঁচকিতে তিনি শিহরণ অনুভব করেন। নিম্ন বাহুতে স্পন্দন উপস্থিত ছিল। ছকে সংশ্লিষ্ট রক্ত পরীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। রোগীর কুঁচকি অঞ্চলের কম্পিউটেড টমোগ্রাফি, পালমোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি এবং সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি অনুরোধ করা হয়েছিল – যা উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

পাঠকের কাছে প্রশ্ন :

উক্ত রোগীর সম্ভাব্য রোগ নিরুপণ কী হবে?

British Medical Journal, 12 June 2020

সঠিক উত্তর ৪৭ নম্বর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

এক রাখালের কাছে একজন প্রধান বিচারপতির ওয়াদা

আরিফ মাহমুদ
আটলান্টা, জর্জিয়া (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) থেকে

সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন প্লেটো। প্লেটোর ছাত্র এ্যারিস্টটল। জ্ঞানের তিন বাতিঘর। ঠিক তেমনি ইমাম জাফর আস সাদেকের ছাত্র ছিলেন জাবির ইবনে হাইয়ান, ইমাম আবু হানিফা আর ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ছিলেন আবু ইউসুফ। জ্ঞানের চার আলোকবর্তিকা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান, রসায়ন সহ ইসলামী শরিয়াহ, ফিকাহ, আইন শাস্ত্র, ন্যায় বিচার ইত্যাদি জ্ঞান জগতের প্রতিটি শাখাকেই তাঁরা আলোকিত করেছেন। ইমাম আবু হানিফার অন্যতম শিষ্য আবু ইউসুফ ছিলেন এক জীবন্ত জ্ঞান জ্যোতি। কিন্তু তার শৈশব ছিলো বেদনা-বিধুর। খুব শৈশবেই আবু ইউসুফ পিতাকে হারিয়ে এতিম হন। সন্তানকে নিয়ে মা নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়লে শিশুপুত্র আবু ইউসুফকে তিনি কুফার বাজারে এক দর্জির দোকানে কাজ করতে পাঠান। সীমিত আয়ে খুব কষ্টে অভাবী মায়ের সংসার চলে। কিছুদিন পর আবু ইউসুফের মা দেখেন - আবু ইউসুফের দৈনিক মজুরি দিন দিন কমে আসছে।

মালিক আবু ইউসুফের কাছে গিয়ে কারণ জানতে চাইলে তিনি ইউসুফের মাকে বলেন : মজুরি তো কম হবেই। আবু ইউসুফ কাজে ফাঁকি দেয়। দোকানে থাকে না।

রাতে আবু ইউসুফ ঘরে ফিরলে মা জানতে চান : তুমি কাজে ফাঁকি দিয়ে প্রতিদিন কোথায় যাও?

পড়তে যাই মা।

কার কাছে?

ইমাম আবু হানিফার কাছে।

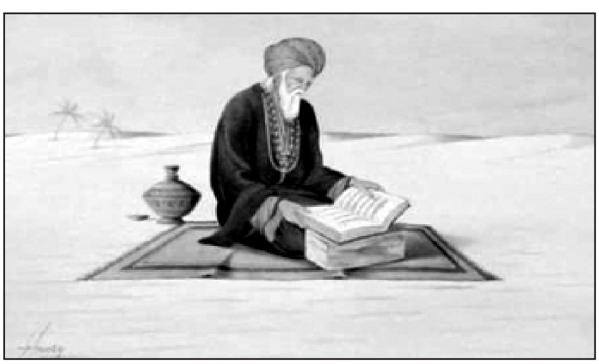

প্রতীকী ছবি

ছেলের পড়ালেখার কথা শুনে মায়ের মন খারাপ হয়। তিনি ছেলেকে বুঝিয়ে বলেন : বাবা, পড়ালেখা করলে আমাদের না খেয়ে উপোস থাকতে হবে। গত দু'দিন শুধু তোমার খাবার যোগাড় করেছি। তুমি কি চাও তোমার মা না-খেয়ে থাকুক? আজ পুরোদিন তুমি কাজ করবে।

আবু ইউসুফ মাথা নেড়ে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়।

সন্ধ্যায় আবু ইউসুফকে কাজ থেকে নিতে এসে মা দেখেন দর্জির দোকানে আবু ইউসুফ নেই। দোকানের মালিক আবু ইউসুফের মাকে ইমাম আবু হানিফার হালাকাটা দেখিয়ে দেন।

মা এসে দেখেন ইমাম আবু হানিফার একেবারে পাশে বসেই আবু ইউসুফ গভীর মনোযোগের সাথে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ইমাম আবু হানিফার কাছ থেকে পাঠ নিচ্ছে।

রুষ্ট মা ইমাম আবু হানিফাকে বলেন : আবু ইউসুফ আমাদের আয়ের একমাত্র অবলম্বন। এখন সে যদি প্রতিদিন এখানে এসে বসে থাকে, তবে আমাদের আহার যোগাবে কে? আমি চাই না আমার ছেলে এখানে এসে সময় কাটাক। ও যদি আসে, আপনার উচিত ওকে কাজে পাঠানো। আগে তো ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবারণ। তারপর না হয় জ্ঞান অন্বেষণ।

ইমাম আবু হানিফা বলেন : মা, আপনি ওকে পড়ালেখা থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমার মন বলছে, ও একদিন এতো বড় হবে, এতো সম্মানিত হবে যে, বাগদাদের খলিফার সাথে বসে সে আলফালুদাজ আহার করবে। আলফালুদাজ হলো এমন একটা বিখ্যাত খাবার যেটা শুধু রাজা-বাদশাহরাই খেয়ে থাকেন। আর খাবার তো বড় কথা নয়, মা। জ্ঞান যার দুনিয়া তার। মানুষ যত জ্ঞান আহরণ করে সে তত বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

মা আবু ইউসুফকে টেনে তোলে দ্রুতগতিতে ঘর থেকে বের হতে হতে বলেন : রুটি খাওয়ার যার সম্বল নেই, সে রাজার সাথে বসে আলফালুদাজ খাবে!

প্রিয় শিষ্যের বিদায়ে ইমাম আবু হানিফার রাতে ঘুম আসে না। সারারাত বিছানায় ছটফট করেন। আবু ইউসুফ তো সাধারণ কোনো ছাত্র নয়। একবার পড়লেই তার সব পড়া হয়ে যায়। একবার শুনলেই তার সব কিছু মুখস্থ হয়ে যায়। সুবেহ সাদিক হয়েছে। কেউ মসজিদে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে। কেউ কাজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পর্ণকুটিরের ভাঙ্গা কাঠের দরজায় মৃদু আঘাতের শব্দ শুনে আবু ইউসুফের মা জেগে ওঠেন। দেখেন শিক্ষকের শিক্ষক, ইমামদের ইমাম, সমস্ত ফিকহবিদরা যার জ্ঞানের তুলনায় ছোট শিশু সেই আলোর দ্যুতি খ্যাত ইমাম আবু হানিফা দাঁড়িয়ে আছেন আবু ইউসুফের জীর্ণ কুটিরের সামনে। মায়ের সাথে আবু হানিফার চুক্তি হয়। প্রতিদিন দৈনিক মজুরির ব্যবস্থা আবু হানিফা করবেন। বিনিময়ে আবু ইউসুফ দর্জির দোকানে কাজ বাদ দিয়ে শুধু পড়ালেখা করবে।

শুরু হয় ইমাম আবু হানিফার তত্ত্বাবধানে শিশু আবু ইউসুফের জ্ঞান সমুদ্রে নিমজ্জনের পালা। একদিন মধ্যাহ্ন। আবু ইউসুফের শরীর খারাপ। নিদ্রাহীন রাতের জ্ঞান অন্বেষা তাকে একটু দুর্বল

করে তোলেছে। আবু ইউসুফের শয্যা পাশে ইমাম আবু হানিফা। শরীর জ্বরে পুড়ছে। এক রাখাল ইমাম আবু হানিফার জন্য প্রতিদিন দুধ নিয়ে আসতো। সে এসে দেখে, হালাকায় আবু হানিফা নেই। খোঁজ নিয়ে সে আবু ইউসুফের বাড়ি আসে। দুধের বাটি আবু ইউসুফের মাকে দিয়ে বলে : আজ থেকে আবু ইউসুফকেও আমি দুধ দিয়ে যাবো। ছেলেটা এতো পড়ালেখা করে। শরীরে একটু শক্তি না থাকলে কি হয়?

ভিতর থেকে মা বলেন : কিন্তু আমাদের তো ছেলের জন্য দুধ কেনার মতো কোনো অর্থ নাই।

দিতে হবে না, মা। আবু ইউসুফ যেদিন বাদশাহর সাথে বসে আলফালুদাজ খাবে, সেদিন আমার কথা স্মরণ করলেই আমি খুশি হবো।

আবু ইউসুফ বলেন : খলিফার সাথে বসে সেই খাবার আপনাকে ছাড়া আমি খাবো না।

ইমাম আবু হানিফা মোনাজাত করেন। মা আল্লাহর কাছে অশ্রুপাত করেন। পাশে বসা রাখাল দোয়ার জন্য হাত তোলেন।

এই ঘটনার পর কেটে গেছে বহু বছর। কুফা, মসুল, বসরা, নজফ, কারবালা, বাগদাদের উপর কত সূর্য উদিত হয়েছে আর কত সূর্য অস্তমিত গেছে। আবু ইউসুফের জ্ঞানের দ্যুতিও ধীরে ধীরে অন্ধকার আকাশের উজ্জ্বল গ্যালাক্সি হয়েছে। সেই আলো ছড়িয়ে পড়ছে কুফা থেকে সমগ্র বাগদাদ পর্যন্ত।

বাগদাদের বাদশাহ তখন হারুনর রশীদ। আমিরুল মোমেনিন। বিশ্বাসীদের খলিফা। আবু ইউসুফকে তিনি ভালো করেই জানেন। রাজ্যের জন্য এমন একজন বিচারক তার খুবই দরকার। খলীফা হারুনর রশীদ তাই আবু ইউসুফকে শুধু কাজী হিসাবে নিয়োগ দিলেন না, ইসলামের ইতিহাসে আবু ইউসুফের জন্য সর্বপ্রথম গ্রান্ড কাজি বা চীফ জাস্টিস – যা বর্তমান সময়ের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক সমতুল্য পদটি তৈরি করেন।

প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে খলিফা খেতে বসেছেন। আবু ইউসুফের অশ্রুসজল চোখ।

খলিফা হতবাক।

আবু ইউসফু বলেন : প্রচণ্ড জ্বরে যখন শরীর পুড়ছিলো, যখন এক বাটি দুধ পান করার মতো সামর্থ্য ছিলো না, তখন ইমাম আবু হানিফা মোনাজাত করে বলেছিলেন : বাগদাদের খলিফার সাথে বসে একদিন আমি আলফালুদাজ খাবো। মা সেই দোয়ায় শরীক হয়েছিলেন। রাখাল ভাইটি কেঁদেছিলেন। খলিফার সাথে আজ খেতে বসে আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না।

খলিফা বলেন : ইমাম আবু হানিফা এমন কথা বলতে পেরেছিলেন। কারণ তিনি আপনাকে চোখ দিয়ে দেখেননি। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন। ইমাম আবু হানিফার মতো শিক্ষক পেয়েছিলেন বলেই আজ আমরা আপনার মতো বিচারপতি পেয়েছি। আবু ইউসুফের প্লেটে খাবার তোলে দিয়ে খলিফা বলেন : এবার খাবার শুরু করুন।

সেটা তো সম্ভব না। জ্বরের শরীরে দুধের যোগানদাতা রাখালের কাছে আমার ওয়াদা ছিলো – উনাকে ছাড়া আমি খলীফার সাথে বসে আলফালুদাজ খাবো না। আগে গিয়ে দেখি উনি বেঁচে আছেন কিনা। যদি বেঁচে থাকেন তবে সাথে করে নিয়ে আসবো। আর যদি ইন্তেকাল করেন, উনার কবরে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিবো। আবু ইউসুফ বাগদাদ থেকে রাখালের খোঁজে কুফার পথে বের হন।

খলিফা অবাক চোখে আবু ইউসুফের দিকে চেয়ে আছেন। একজন রাখালকে দেয়া ওয়াদার কথা যিনি ভুলে যান না, তিনি তো কোনো মানুষকে তার প্রাপ্য ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না। খলিফা বলেন : আমি আবু ইউসুফকে চিনতে ভুল করিনি। আমি বিচারক বাছাই করতে ভুল করিনি। যে ওয়াদা পালন করে, তাকেই তো আল্লাহ পৃথিবীতে এবং আখিরাতে সম্মানিত করেন।

আজ আমরা বুঝে বা না বুঝে কত ওয়াদা করি। রাস্তা দিবো, ব্রীজ দিবো, সড়ক দিবো, ন্যায় বিচার দিবো, মানুষকে জীবনের নিরাপত্তা দিবো। ছোট, বড় আমাদের কত রকমের ওয়াদা। আমাদের ওয়াদা করারও শেষ নেই, ওয়াদা ভাঙ্গারও শেষ নেই। অথচ একজন রাখালের সাথে করা ওয়াদা পালনের জন্য দেশের প্রধান বিচারপতি কুফার পথে হেঁটেছিলেন। ইসলামকে মহিমান্বিত করা সেই মানুষগুলো আর নেই। মহাকালের অনন্ত যাত্রায় সেই জগৎজ্যোতি জাস্ট আর ট্রাস্টরা চলে গেছে। শুধু ডাস্ট আর রাস্টরাই আজ রয়ে গেছে।

***** এই গল্পগুলো যদি শিশু-কিশোরদের পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হতো. তাহলে কত-না ভালো হতো।*

▲গণস্বাস্থ্য

পৃথিবী, পরিবেশ, মানুষ ও খাদ্য

ভুট্টা

ভুট্টায় রয়েছে নানা পুষ্টিগুণ। প্রতি ১০০ গ্রাম ভুট্টায় ১৯ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ২ গ্রাম ফাইবার বা আঁশ, ৩ গ্রাম প্রোটিন, ১.৫ গ্রামের কম চর্বি থাকে। ভুট্টা অ্যানিমিয়ার ঝুঁকি কমায়। এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে, যা রক্তের লোহিত কণিকা তৈরি হতে সাহায্য করে। ভুট্টায় রয়েছে ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস – যা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমায়। এর কোন্ ফাইটো কেমিক্যাল শরীরে ইনসুলিনের শোষণ ও নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত থাকে, ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও কমে। ভুট্টা আঁশ বা ফাইবার জাতীয় শস্য। এর কার্বোহাইড্রেট যৌগ দেরিতে হজম হয় এবং শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। এর বিটা ক্যারোটিন চোখ ও ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। তবে মনে রাখতে হবে, ভুট্টার কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আছে। এর থেকে অনেক সময় অ্যালার্জি হতে পারে। ভুট্টা বেশি পরিমাণে খেলে হজমের সমস্যা দেখা দেয়। কাঁচা ভুট্টা খেলে ডায়ারিয়া হতে পারে।

সংবাদ পরিষেবা, ফেব্রুয়ারি ২০২০

নৈতিকতার অধঃপতনের যাত্রায় কতিপয় 'নমস্য' শিক্ষাবিদের ভূমিকা

সা কা ম আনিছুর রহমান খান কামাল

এ সমাজ জীর্ণ সমাজ, এ সমাজ ভাঙতে হবে। ভাঙতে গেলে বাঁধবে লড়াই, এ লড়াইয়ে জিততে হবে' – বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে উদ্দীপ্ত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোগান এটা। শিক্ষা, শান্তি, প্রগতির মশাল জ্বালিয়ে শিক্ষাঙ্গনে কাজ করে চলেছে এই ছাত্র সংগঠন। শিক্ষাবিদগণ তাঁদের কাছে নমস্য। তাঁদেরকেই তারা অনুসরণ করে তাঁদের জীবনাচরণ ও জীবনদর্শন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে তারা ব্রতী হয়। তাই শিক্ষাকে বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড। তবে ভাষা আন্দোলনের অগ্রপথিক ডা. সাঈদ হায়দার (নান্নু)-এর মতে শিক্ষা জাতির মস্তিষ্ক। বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ ইয়াকুব আলী তাঁর প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে যা বললেন তা রোমহর্ষক। তিনি একদিন অধ্যক্ষের কক্ষে বসেছিলেন। তাঁকে বসিয়ে রেখেই অধ্যক্ষ মহোদয় 'হিসাব রক্ষক' ও একজন 'ছাত্রনেতা'কে ডাকলেন। উভয়ে যথারীতি হাজির হলো। অধ্যক্ষ মহোদয় হিসাব রক্ষককে বললেন : ছাত্রনেতাকে একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা দিতে। হিসাব রক্ষকের প্রশ্ন : কোথা থেকে দেবেন। এবার অধ্যক্ষ মহোদয় রাগে অগ্নিশর্মা হলেন। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করলেন হিসাব রক্ষককে । হিসাব রক্ষককে বলে দিলেন : ভাউচার তৈরি করে টাকা দিতে। নইলে তার চাকুরী থাকবে না বলে শাসালেন।

অধ্যক্ষ মহোদয় মাঝে মাঝেই ভোজসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কতিপয় রাজনৈতিক নেতাকে এবং সেই সাথে কলেজ ছাত্র সংসদে বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন – এরূপ কতিপয় সাবেক ছাত্র নেতাকে দাওয়াত করতেন। মূলত দাওয়াত তাদেরই করতেন যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন। কলেজ সীমানায় ফাঁকা জায়গায় দোকান বানিয়ে ভাড়া দিয়েছিলেন। কর্মব্যস্ত রাস্তা অচল হয়ে গেলে জনদাবী উঠে দোকানপাট উচ্ছেদ করার। প্রশাসন উদ্যোগ নেয় কিন্তু অধ্যক্ষ বাহিনীর কারণে কলেজ সীমানার কিছু দোকান সরাতে বাধার সম্মুখিন হয়। জনদাবী প্রবল হলে উচ্ছেদ অভিযান সফল হয়। এভাবে কতিপয় প্রভাবশালী (!)-কে হাতে রেখে ভাউচার এদিক সেদিক করে কলেজ তহবিলের অর্থ তছরূপ করতেন। ওয়াকিবহাল মহল সব বুঝেও নিরূপায় থাকতে বাধ্য হতেন।

অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ তাঁরা চির নমস্য। আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে সর্বঅধ্যক্ষ শিব প্রসন্ন লাহিড়ী, অমরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী (এ এন চৌধুরী), নুরুর রহমান খান, কাজী রফিকুল্লাহ প্রমুখের মতো শিক্ষাবিদকে। ব্যক্তিত্ব, ভাবগাম্ভীর্য, সততা, নিষ্ঠা এসব চারিত্রিক গুণাবলীতে তাঁরা ছিলেন গুণান্বিত।

অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ তাঁরা চির নমস্য। আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে সর্বঅধ্যক্ষ শিব প্রসন্ন লাহিড়ী, অমরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী (এ এন চৌধুরী), নুরুর রহমান খান, কাজী রফিকুল্লাহ প্রমুখের মতো শিক্ষাবিদকে। ব্যক্তিত্ব, ভাবগাম্ভীর্য, সততা, নিষ্ঠা এসব চারিত্রিক গুণাবলীতে তাঁরা ছিলেন গুণান্বিত। তহবিল তছরূপ, অর্থ দিয়ে কতিপয় ছাত্রনেতৃবৃন্দ [!]-কে বশে রাখা, ভোজসভা করে কতিপয় নাগরিককে সুনজরে এনে যথেচ্ছভাবে বেপরোয়া গতিতে নৈতিকতার স্খলন ঘটানোর প্রবণতার কালিমা তাদেরকে এতটুকু স্পর্শ করেনি। কালের প্রবাহে তাদের কোন কোন উত্তরসূরী যখন এরূপ কালিমা নির্দ্বিধায় মেখে বুক ফুলিয়ে জনসমক্ষে শিক্ষাবিদ বলে পরিচয় দেন তখন জনগণের বিবেক যারপরনাই প্রতিনিয়ত দংশিত হতে থাকে। তাদের মাঝে প্রশ্ন জাগে : তাদের সন্তানেরা কাকে আদর্শ মানুষ মেনে চরিত্র গড়ে তুলবে! কার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নৈতিকতা, মানবতা, সৎ চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করবে!

জনগণ বিস্মিত হলো খবর শুনে ও দেখে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুস সোবাহান তার কর্মের মেয়াদ শেষে দায়িত্ব হস্তান্তরের অব্যবহিত আগে শতাধিত কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন, অনিয়ম করে। বিষয়টি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ পর্যন্ত গড়িয়েছে। মাননীয় আদালত ঐ নিয়োগ স্থগিত করেছেন। খবরের কাগজ ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এটা ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। কতিপয় উপাচার্যের এরূপ আচরণ নতুন নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে তারা পেয়েছেন। কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ সংযোগ নিজের মেসে লাগিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাত থেকে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেছেন। পরীক্ষার খাতা উলট পালট করেছেন ক্ষমতার অপব্যবহার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালা প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকার বশিলায় জমি কিনতে গিয়ে জমির দাম দ্বিগুণ ধরে একই বিল চারবার পরিশোধ করেছেন। এসব করে তারা মামলার আসামী হয়েছেন। ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় আসামী হয়ে মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। এরূপ কথা বিদগ্ধজনের কাছ থেকে জানা গেছে যে জঙ্গী বলে নিরিহ ছাত্রকে গোপনে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, অভিভাবকেরা আসলে তাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে ঐসব ছাত্রদেরকে মুক্ত করা হয়েছে।টাকার অঙ্ক ভাগাভাগি হয়েছে এবং 'উপাচার্য' এই টাকার ভাগ নিয়েছেন [ছিঃ ছিঃ]। নমস্য শিক্ষাবিদদের সম্পর্কে এরূপ রটনা ও প্রচারণা নিতান্ত গর্হিত ও অবমাননাকর, কিন্তু যখন এর সত্যতা মিলে, অভিযোগ আদালত পর্যন্ত গড়ায়, অভিযোগনামা দাখিল হয়, শিক্ষাবিদ আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় পাদুকা খুলে নতশিরে দাঁড়ায় তখন

সাধারণ মানুষের লজ্জার সীমা থাকে না। এসব দেখে বিচারক ও আইনজীবীদেরও বিবেক দংশিত হতে থাকে। জনগণের মনে প্রশ্ন জাগে এসব ব্যক্তিদের কাছে তাদের সন্তানদের বিদ্যার্জন, নৈতিকতা শিক্ষা ও চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের জন্য পাঠাতে হয়। তারা হতাশ হয়।

কোন কোন শিক্ষাবিদ আবার 'বেসরকারী সংস্থা' খুলে তার কর্ণধার হন। মানুষ ভাবে এরা তাদের অনেক উপকার করবে। কিন্তু যখন তারা দেখে উচ্চহারে সুদের কারবার করছেন, টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ করছেন, 'ভাউচার' কেলেঙ্কারী করছেন, এসব কেলেঙ্কারী যখন নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও পরিদর্শন প্রতিবেদনে ধরা পড়ছে তখন তাঁদের আশা ভঙ্গ হয়। নিরীক্ষক পরিদর্শকেরাও এসব গুরুতর ত্রুটি দেখে যারপরনাই লজ্জিত হন। শিক্ষাবিদের নৈতিক অধঃপতন দেখে।

আরো লজ্জার কথা পরীক্ষার হলে পরীক্ষা চলাকালে একজন শিক্ষক একজন ছাত্রীর সাথে অত্যন্ত গর্হিত অশালীন আচরণ করলেন। ছিঃ ছিঃ রব উঠলো। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাকে শিক্ষক পদে বহাল রাখলেন। এ প্রসঙ্গে আমার স্কুল জীবনের কথা মনে পড়ে। পাবনা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন সত্যেন পাল। একদিন রাতে আকস্মিকভাবে একটা ঘটনা ঘটলো। একজন শিক্ষক আদিম প্রবৃত্তি সঞ্জাত অপরাধ করতে উদ্যত হয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের আপত্তিজনিত চিৎকারের কারণে পার্শ্ববর্তী সকলের প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেন। ঐ রাত্রেই ঘটনাটি প্রধান শিক্ষকের গোচরীভূত করা হলো। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধান করে ঘটনা সত্যতার বিষয়ে নিশ্চিত হলেন। ঐ রাত্রেই অভিভাবকদের ডাকলেন সবার সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিলেন ঐ শিক্ষক আর স্কুলে শিক্ষক পদে থাকবেন না। অনুরোধ এসেছিল মানবিক দিক বিবেচনা করে প্রথমবারের মতো ক্ষমা করে দেওয়ার। কিন্তু প্রধান শিক্ষক তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। তাঁর সুস্পষ্ট কথা নৈতিকতার স্খলন ঘটায় ঐ শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর হবার যোগ্যতা হারিয়েছেন। তার জীবিকা ও সম্মানের চাইতে ছাত্রদের উন্নত চরিত্রে গড়ে উঠার প্রশ্ন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টা নিয়ে আর কোন প্রকাশ্য আলাপ আলোচনা হয় নাই – হবার কোন অবকাশও ছিল না। তবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্তাটি পৌঁছে গিয়েছিল। একজন স্কুল শিক্ষকের যে নীতিবোধ, মানুষ গড়ার আঙিনায় পরিবেশ বহাল রাখার নিজের নৈতিক দায়িত্ববোধ ও অঙ্গীকার ছিল, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্যদের এ যুগে আছে কিনা সেটা নিয়ে যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন রয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা যায় যে উত্তরাঞ্চলের একটি স্বনামখ্যাত 'পাবলিক' বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততপক্ষে সাতজন 'উপাচার্য'-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম, তহবিল তছরূপ, স্বজনপ্রীতিসহ বহুবিধ অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে। এজন্য তাঁদেরকে আদালতের কাঠগড়ায় করজোরে দাঁড়াতে হয়েছে। আমরা তো মকবুলার রহমান সরকার (এম আর সরকার), মুসলিম হুদা, কছিমুদ্দিন মোল্লা, মোশাররফ হোসেন, রফিকুল ইসলাম, আবদুল মঈদ, আ ন শামছুল হক প্রমুখের মতো শিক্ষাবিদকে দেখেছি। তাঁদেরকে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকবৃন্দ ভক্তিশ্রদ্ধা করেছে। আজকে আমরা দেখছি প্রাগুক্তমতে নৈতিকতার স্খলনজনিত অপরাধে [গুরুতর অসদাচারণের] অভিযুক্তদের অভিযোগ বিচারাধীন থাকলেও তারা শিক্ষকতার পদে বহাল আছেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদ হারালেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি পেয়েছেন। সেখানে নিজে গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ পদে আসীন হয়েছেন। আর একজন উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ উপায়ন্তর না দেখে The General Clauses Act মোতাবেক নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করে উপাচার্য পদ থেকে অপসারণ করেছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান মতে : গুরুতর অসদাচারণের অভিযোগে কোন রাষ্ট্রপতি অভিযুক্ত হলে তাঁকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অভিশংসন করা হয় [অনুচ্ছেদ-৫২]। সরকারী কর্মচারীদের কারো বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাঁকে প্রথমত বরখাস্ত করা হয়, সাজাপ্রাপ্ত হলে চাকুরীচ্যুত করা হয়। মামলা শেষ হলে বেকসুর খালাস হলে চাকুরী ফিরে পায়। অধঃস্তন আদালতের কোন বিচারক এইরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে চাকুরীচ্যুত হলে তিনি আর আইন সংক্রান্ত পেশায় যুক্ত হতে পারেন না। 'বাংলাদেশ বার কাউন্সিল' তাঁকে সনদ দেয় না। কিন্তু শিক্ষাবিদদের বেলায় এর ব্যতিক্রম কেন?

খুব বেশিদিন হয়নি একজন উপাচার্যকে একজন রাজনীতিবিদ বলেছিলেন : 'আপনার চাইতে উপযুক্ত শিক্ষক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। কিন্তু আপনি দলের লোক বলেই আপনাকে এই পদে বসানো হয়েছে। আপনাকে দলের কথা শুনতে হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রয়েছে রাজনৈতিক, পারিবারিক প্রভাব। সকলের ক্ষেত্রে না হলেও, কোন শিক্ষকের জামাতা, কোন শিক্ষকের পুত্র, কোন শিক্ষকের কন্যা এরকম সম্পর্কেও সূত্র ধরেই অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিয়োজিত হয়েছেন। কেউ হয়েছেন রাজনৈতিক পরিচয়ে। এদের দাপটে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষকতার ব্রত নিয়ে যারা শিক্ষাঙ্গনে এসেছেন তারা বর্তমানে হয়েছেন কোণঠাসা। সে কারণেই শিক্ষাঙ্গন অশান্ত। এ থেকে পরিত্রাণ চাই। তার জন্য চাই প্রাগুক্ত মতে গুরুতর অসদাচারণের দায়ে অভিযুক্তদের শিক্ষাঙ্গন থেকে বিদায়।

▲গণস্বাস্থ্য

লেখক : সাবেক জেলা ও দায়রা জজ। বর্তমানে এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
কার্যকরী সভাপতি এবং সদস্য, স্থায়ী কমিটি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল – জে এস ডি, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ।

প্রচ্ছদ রচনা

স্বচিকিৎসা : নিজের চিকিৎসা কিঞ্চিৎ নিজে করুন

গৌতম মিত্রী

প্রস্তাবনা : কোভিড-১৯ এর দৌলতে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ রোগের চিকিৎসার কিছু কলাকৌশল শিখে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। জ্বর হলে সাধারণ মানুষ দেহের তাপমাত্রা থার্মোমিটার দিয়ে মেপে নিতে পারবেন – এটা সমাজে চালুই ছিল। অনেকে আবার রক্তচাপ, রক্তের সুগার আর রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা মেপে নিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। থার্মোমিটারের ব্যবহারের সাথে সাথে রক্তচাপ, রক্তের সুগার নিজেই মেপে নেওয়া কাজের বলে চিকিৎসক-বৈজ্ঞানিকরা অনেক দিন ধরেই বলে আসছিলেন। রক্তচাপ ও রক্তের সুগার মাপার নির্ভরযোগ্য যন্ত্র এখনও থার্মোমিটারের মতো গ্রামেগঞ্জের মুদিখানা বা মনিহারি দোকানে সহজলভ্য নয়, তার দামও যথেষ্ট। তবে কিনা চাঁদা তুলে অথবা পাড়ার ক্লাবের উদ্যোগে একটা রক্তচাপ মাপার 'ডিজিটাল' যন্ত্র ও একটি রক্তের সুগার মাপার যন্ত্র কিনে অনেকে মিলে সেটা ব্যবহার করতেই পারেন। এই যন্ত্রগুলোর এক একটার বর্তমান দাম আড়াই হাজার টাকার মতো। রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের জন্য খরচ প্রতি মাসে চারটি পেন্সিল সাইজের (এএ) ব্যাটারি। রক্তের সুগার মাপার জন্য প্রতিটা পরীক্ষার জন্য একটি করে রাসায়নিক মাখানো একবারের জন্য ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের শলাকা (চলতি কথায় 'স্ট্রিপ') লাগে – যার প্রতিটার মূল্য ২০-২৫ টাকা। এই রকম এক একটা যন্ত্র অনেকে মিলে কেনা যেতেই পারে। রক্তের সুগারের মাত্রা মাপলে প্রত্যেকের জন্য এক ফোঁটা রক্ত বের করার জন্য একটা করে আঙুলে ফোটানোর পিন (ল্যান্সেট) বা বিকল্প হিসাবে ইনজেকশনের সূঁচ লাগে। অর্থাৎ একটা রক্তের সুগারের মাত্রা নির্ণয়ের যন্ত্র – যার পরিচিত নাম গ্লুকোমিটার, সেটা বারোয়ারি হলেও প্রত্যেকের জন্য একাধিকবার ব্যবহারের উপযোগী একটা ল্যান্সেট ও প্রত্যেকবার পরীক্ষার জন্য একটা করে টেস্ট স্ট্রিপ লাগে। একটা প্যাকেটে ১০, ২৫ অথবা ৫০টা করে টেস্ট স্ট্রিপ থাকে। আর প্যাকেটের সিল খুললে সেটা তিন মাসের মধ্যে ব্যবহার করে নিতে হয়। এজন্য টেস্ট স্ট্রিপের প্যাকেট বা শিশি বারোয়ারিভাবে কেনা যেতে পারে। কোন সদস্য কতবার পরীক্ষা করছেন, সেই মতো চাঁদা তুলে সবাই মিলে সেই টেস্ট স্ট্রিপের শিশি কিনে নিতে পারেন। ল্যাবরেটরিতে রক্তের সুগার পরীক্ষার জন্য ৭০ থেকে ১৫০ টাকা লাগে। তার সাথে বাড়ি থেকে ল্যাবরেটরিতে অন্তত দু'বার যাওয়া-আসার খরচটা যোগ করতে হবে – একবার রক্তের নমুনা দেওয়ার জন্য আর দ্বিতীয়বার রিপোর্ট আনার জন্য। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরির রিপোর্টের চেয়ে বাড়িতে আঙুলে পিন ফুটিয়ে এক ফোঁটা রক্ত বের করে 'ক্যাপিলারি ব্লাড গ্লুকোজ' (CBG) বা স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিন যন্ত্রে মাপা রক্তের সুগারের মাত্রা বেশি কাজের বলে বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত।

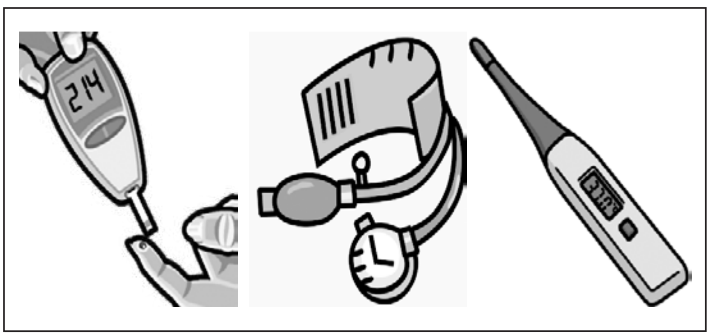

পর্ব-১ : আমরা প্রথমে ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করে সঠিক রক্তচাপ নির্ণয়ের কথা আলোচনা করবো।

এই আলোচনায় জেনে নিই, উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে রাখতে হবে হৃদরোগ, মস্তিষ্কের স্ট্রোক, কিডনি, অকেজো হয়ে যাওয়ার রোগ আটকানোর জন্য। **যদিও প্রাথমিক স্কুলের বয়সে শিশুর অভিভাবক এবং স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যদি অধিক সচেতন হয়ে শিশুকে স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলীতে অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর খাবার ও স্বাস্থ্যকর বিনোদনে শিক্ষিত করে দিতে পারেন, তবে পরিণত বয়সে তাঁদের উচ্চ রক্তচাপ হবার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।** এটা এখনও একটা স্বপ্ন মাত্র। তাই এখনও উচ্চ রক্তচাপের নিয়ন্ত্রণের চিকিৎসা প্রাসঙ্গিক। সফল রক্তচাপের চিকিৎসার জন্য সাধারণ মানুষকে আজ নিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ নিশ্চিত করার মাপজোকের কলাকৌশল শিখে নিতে হচ্ছে। এইক্ষণে আমাদের পরিবারে, পাড়ায়, সমাজে উচ্চ রক্তচাপ একটি উল্লেখযোগ্য রোগ। এর নিয়ন্ত্রণের চিকিৎসায় নিয়মিত রক্তচাপ মাপার প্রয়োজন সফল চিকিৎসার জন্য। হাসপাতালে আর ডাক্তারের কাছে কত ঘন ঘন আর যাওয়া যায়! ডাক্তারের কাছে গেলে ভয়েই খানিকটা রক্তচাপ বেড়ে যায় বলে যে আশঙ্কা, সেটা মোটেই হেলাফেলার নয়। ডাক্তারের মাপা রক্তচাপ যখন ঘরোয়া পরিবেশে নিজের মাপা রক্তচাপের চেয়ে বেশি হয় তখন সেই অবস্থাকে হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন বলে। এটা চিকিৎসা বিজ্ঞান স্বীকার করে ও সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারের মাপা উচ্চ রক্তচাপ বেঠিক বলে বিবেচিত হয়। ডাক্তার বেশ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কম কথা বলেন। দেখলেই বুক দুরুদুরু করে, আমরা শীতকালেও ঘেমে যাই, রক্তচাপও

বেড়ে যায়। পাড়ার দোকানে আগের দিনই রক্তচাপ মাপা হয়েছিল ১০ টাকা খরচ করে। রক্তচাপ মেপে ওষুধের দোকানদার, হাফপ্যান্টের বয়সে দেখা হারু বলল, দাদা আপনার প্রেসার বেশ কম। ডাক্তারবাবুকে বলবেন কিছু ওষুধ কমিয়ে দিতে। কিন্তু এ কী হলো? ডাক্তার ঝটিতে রক্তচাপ মেপে বললেন, কী করেছেন? ওষুধ খাচ্ছেন তো? এত বেশি কেন আপনার প্রেসার? এবার দেখছি ওষুধ বাড়াতে হবে। এখানে ওষুধ বাড়ানোর আগে সঠিক রক্তচাপ মাপার অন্য উপায়ের অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এটাই হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন – এটার কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। সেটা পরে করা যাবে।

রক্তচাপ মাপা যখন এতটাই চাপের, মানে উৎকণ্ঠার তখন রক্তচাপ মাপার উপায়কে বিচারের কাঠগড়ায় খাড়া করা যেতেই পারে। সাইকেল, রিক্সা, স্কুটার অথবা চার চাকার গাড়ির চাকার প্রেসার মাপা এতটা হাঙ্গামার নয়। মাসে এক বা দু'বার মেপে নিয়ে হাওয়া দিয়ে গাড়ির চাকার প্রেসার বজায় রাখা ততটা খরচের নয়। তেমনি নিজেই নিজের রক্তের চাপ মেপে নেওয়া কেবল সবচেয়ে সস্তাই নয়, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যও বটে।

রক্তচাপ মাপার জন্য চিকিৎসকের পরিষেবা দ্বারস্থ হওয়া একটা বাজে খরচ কেবলই নয়, ঘরে মাপা রক্তের চাপ মাপার পদ্ধতি এখন বেশ উন্নত আর সঠিক বলে মনে করা হচ্ছে। হাসপাতালে অথবা চিকিৎসকের মাপা রক্তচাপ অনেক সময় কিছুটা বেড়ে যায় উৎকণ্ঠার কারণে। অচেনা ব্যক্তির সামনে রুগ্ন ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই মানসিক চাপে থাকেন। এই চাপের ফলে ঘরোয়া পরিবেশের রক্তচাপ খানিকটা বেড়ে যায়। এটার গাল ভরা নাম 'হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন'।

রক্তচাপ মাপার উপায়

কোভিডের দৌলতে পালস্ অক্সিমিটারের সাথে সাথে রক্তচাপ মাপার ডিজিটাল যন্ত্রও বেশ বিকোচ্ছে। ঘরে থার্মোমিটার না থাকলেও নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্ত মানুষের ঘরে রক্তচাপ মাপার যন্ত্র ঢুকে পড়ে ও তার ঘন ঘন ব্যবহার বেড়ে যায়। নিজের ঘরে না থাকলেও প্রতিবেশীর কাছ থেকে যন্ত্র ধার করে রক্তের চাপ মেপে নেওয়া যায়। কোভিডের আগেও এই যন্ত্রটা কিছু কিছু সচ্ছল মানুষের কাছে ছিল। তবে সঙ্গত কারণেই করোনাকালে এটার ব্যবহার বেড়ে গেছে। ডাক্তারের কাছে অথবা হাসপাতালে রুগ্ন মানুষ যেমন যেতে দ্বিধা করছেন, ডাক্তাররাও আতঙ্কে চিকিৎসাটা অনলাইনে সেরে নিচ্ছেন। এমতাবস্থায় রোগীকে ঘরেই রক্তচাপ মেপে নিতে হচ্ছে। আমেরিকা-ইউরোপে অবশ্য রক্তের সুপার মাপার মতোই রক্তচাপ ঘরেই মেপে নেবার নিদান দিচ্ছেন চিকিৎসক মহল। কারণ অবশ্য অন্য। রক্তচাপ মাপার জন্য চিকিৎসকের পরিষেবা দ্বারস্থ হওয়া একটা বাজে খরচ কেবলই নয়, ঘরে মাপা রক্তের চাপ মাপার পদ্ধতি এখন বেশ উন্নত আর সঠিক বলে মনে করা হচ্ছে। হাসপাতালে অথবা চিকিৎসকের মাপা রক্তচাপ অনেক সময় কিছুটা বেড়ে যায় উৎকণ্ঠার কারণে। অচেনা ব্যক্তির সামনে রুগ্ন ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই মানসিক চাপে থাকেন। এই চাপের ফলে ঘরোয়া পরিবেশের রক্তচাপ খানিকটা বেড়ে যায়। এটার গাল ভরা নাম 'হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন'।

ডাক্তাররা সাদা আলখাল্লার মতো অ্যাপ্রন বা কোট পরেন বলে অমন নাম। অর্থাৎ মানের দিক দিয়ে ঘরে মাপা রক্তচাপ চিকিৎসার প্রয়োজনে অধিক কাম্য। তবে সে ক্ষেত্রে রক্তচাপ মাপার সঠিক পদ্ধতি রোগীকে শিখতে হবে। সাইকেল বা হারমোনিয়াম কেবল কিনলেই সেটা ব্যবহার করা যায় না – সাইকেল চালানো আর হারমোনিয়াম বাজানো শিখতে হয়। বিদেশে সাধারণ মানুষকে রক্তচাপ মাপার প্রশিক্ষণের কাজটা চিকিৎসক অথবা অন্য কোনো স্বাস্থ্যকর্মী করেন। আমাদের দেশে তার চল নেই, সেই প্রয়োজনটাও সমাজ উপলব্ধি করে না।

ডিজিটাল যন্ত্র দিয়ে রক্তচাপ মাপার স্বীকৃত পদ্ধতি

ক. যার রক্তচাপ মাপা হবে সেই মানুষটির প্রস্তুতি : ১. রক্তচাপ মাপার আধঘণ্টা আগে থেকে ধূমপান, চা এবং কফি পানে বিরত থাকতে হবে। ২. মানুষটি একটি চেয়ারে চুপ করে উৎকণ্ঠারহিতভাবে হেলান দিয়ে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট বসে থাকবেন। পায়ের পাতা মাটিতে আরামদায়কভাবে পাতা থাকবে। মোবাইল অথবা টেলিভিশন চোখের সামনে থাকবে না। ৩. চেয়ারে বসার আগে আবশ্যিকভাবে টয়লেটে গিয়ে মূত্রত্যাগ করে আসবেন। ৪. যে মানুষটির রক্তচাপ মাপা হচ্ছে আর যিনি সেটা মাপছেন তাঁরা কেউই বাক্যালাপ করবেন না। বেশ কিছু স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল রক্তচাপ মাপার যন্ত্র দিয়ে নিজেই নিজের রক্তচাপ মাপা যায়, দ্বিতীয় কোনো মানুষের সাহায্য লাগে না। ৫. চেয়ারে বসার আগে হাতাওয়ালা উর্ধ্বাঙ্গের পোশাক খুলে হাতাবিহীন পোশাক পরে নিতে হবে। ৬. শুয়ে বা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রক্তচাপ মাপা চলবে না।

খ. সঠিকভাবে যন্ত্রের ব্যবহার : ১. কবার আগে রক্তচাপ মাপার যন্ত্রটির কর্মক্ষমতা একটি নির্ভরযোগ্য যন্ত্রের সাথে তুলনা করে বিচার করে ব্যবহারের উপযুক্ত বলে অনুমোদন করে নিতে হবে। ২. যার রক্তচাপ মাপা হচ্ছে তার হাত (সাধারণত ডান হাত) চেয়ারের হাতলে বা টেবিলে আরামযোগ্যভাবে রাখতে হবে। ৩. রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের একটি অংশ – যাকে 'কাফ' বলে, সেটা বাহুতে সঠিকভাবে আবৃত করতে হয়। এটা একটা ভেলক্রো দেওয়া আবরণ, যেটা বাহুকে আবৃত করে আর তার মধ্যে রাবারের একটি বেলুনকে তার চাপ বাড়া-কমা করতে দেয়। এটাই কাফ। রক্তচাপ মাপার যন্ত্র চালু হলে কাফের মধ্যের বেলুনের চাপ বাড়া-কমা করে হাতের রক্তনালীর মধ্যের রক্তের চলাচলের বিভিন্ন সময়ের রক্তচাপ জেনে নিয়ে রক্তচাপের দুটো

সংখ্যা (সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক) আর হৃদস্পন্দনের হার বা পালস রেট যন্ত্রের ডিসপ্লেতে জানিয়ে দেয়। এই কাফটা ডান হাতের (ডান হাত না থাকলে বিকল্পে বাম হাতে) মাঝখানে (কনুই আর কাঁধের মাঝে) লাগাতে হবে। রক্তচাপ মাপার যন্ত্রটা রাখতে হবে হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ নিলয়ের (রাইট ভেন্ট্রিকল) উচ্চতায়। ৪. সঠিক মাপের কাফ অর্থাৎ বাহু-আবরণের মাপ বেছে নিতে হবে – যাতে আবরণের মধ্যের রাবারের বেলুন বাহুর পরিসীমার অন্তত ৮০ শতাংশ আবৃত করে। বড় বা ছোট মাপের কাফ সঠিক রক্তচাপ নির্ণয় করতে পারে না। ৫. অন্তত একবার দুই বাহুতে রক্তচাপ নির্ণয় করে দেখে নিতে হবে দুই হাতে নির্ণীত রক্তচাপের পার্থক্য ২০ মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের চাপের চেয়ে কম কিনা। এমনটি হলে সর্বোচ্চ নির্ণীত রক্তচাপ গৃহীত হবে। দুই হাতে নির্ণীত রক্তচাপের পার্থক্য ২০ মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের চাপের চেয়ে বেশি হলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে কোনো হাতের প্রধান রক্তনালীর সরু হয়ে যাবার রোগ আছে কিনা সেটা নির্ণয় করতে।

গ. রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য সঠিক রক্তচাপ মাপতে হবে : ১. অন্তত প্রথমবার ডান ও বাম বাহুতে রক্তচাপ মাপতে হবে। যে হাতে সর্বোচ্চ রক্তচাপ নির্ণীত হবে সেটাই চিকিৎসার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং রোগীর এই বৈশিষ্ট্যটা মনে রাখবার জন্য এই তথ্যটি মনে রাখতে হবে ও নথিভুক্ত করতে হবে। ২. একাধিকবার রক্তচাপ মাপার জন্য দুইবার মাপামাপির মধ্যে ন্যূনতম পাঁচ মিনিট সময় দিতে হবে। ৩. সঠিক পদ্ধতিতে রক্তচাপ কেবল একবার মাপলেই হবে না। বিস্তর ফারাক না হওয়া রক্তচাপের সংখ্যা অন্তত তিনবার মেপে রক্তচাপের দুটো (সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক) সংখ্যার প্রত্যেকটার গড় করে সেটা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং তারিখ ও সময় উল্লেখ করে সেটা লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

স্বল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে ডিজিটাল রক্তচাপ মাপার যন্ত্র সঠিকভাবে রক্তচাপ নির্ণয় করতে পারে না। নাড়ির গতি অত্যন্ত দ্রুত হলে (মিনিটে ১৫০ বা তার বেশি) বা ছন্দপতনের রোগে হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হলে (এরিদ্‌মিয়া, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, বেশি পরিমাণের এক্টোপিক বিট) ডিজিটাল রক্তচাপ মাপার যন্ত্র হাত তুলে দিয়ে বলে – এটা আমাকে শেখানো হয়নি অর্থাৎ যন্ত্রের ডিসপ্লেতে 'এরর মেসেজ'। বিশ্বস্ত যন্ত্র ভুল করে ভেজাল তথ্য পরিবেশন করে না। এই রকম ক্ষেত্রে এখনও প্রথাগত স্টেথোস্কোপ দিয়ে রক্তচাপ মাপার উপায় প্রাসঙ্গিক।

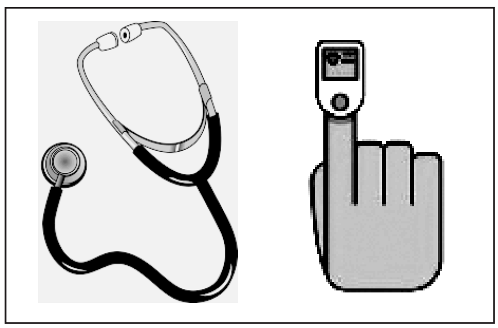

স্টেথোস্কোপ দিয়ে রক্তচাপ মাপার প্রথাগত পদ্ধতি

স্টেথোস্কোপ দিয়ে রক্তচাপ মাপার প্রথাগত পদ্ধতিতে কনুইয়ের ইঞ্চিখানেক উপরে বাহুতে বর্ণিত নিয়ম মেনে চাপ সৃষ্টিকারী 'কাফ' দিয়ে টাইট করে আবৃত করে নিতে হবে। তারপর একটা কাফ বেরিয়ে আসা একটা রাবারের নলের প্রান্তে লাগানো একমুখী ভাল্বযুক্ত বাল্ব হাতের মুঠোয় চেপে চেপে কাফের মধ্যের রাবারের বেলুনে হাওয়া ভরে কাফের প্রেসার বাড়াতে হবে। অন্য হাত দিয়ে ওই হাতের কব্জিতে নাড়ির স্পন্দনের ইঙ্গিতে মনোযোগ দিতে হবে। বাহুতে লাগানো কাফের প্রেসার ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার জন্য বাহুর প্রধান রক্তনালীর (ব্রাকিয়াল আর্টারি) অভ্যন্তরীণ সর্বোচ্চ চাপের বেশি হয়ে গেলে রক্তের প্রবাহ থেমে যাবে। তখন কব্জিতে রাখা অন্য হাতের আঙুলে নাড়ির স্পন্দন আর অনুভূত হবে না। এই সময়ে যন্ত্রের প্রেসার নির্দেশক ডায়ালে অথবা যন্ত্রভেদে পারদ স্তম্ভের উচ্চতা দেখে কাফের মধ্যের চাপের সংখ্যাটা (পারদ স্তম্ভের চাপের এককে mm of Hg) মনে রাখতে হবে। এই সংখ্যায় সিস্টোলিক অর্থাৎ রক্তচাপের উপরের সংখ্যাটার নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। হাতের মুঠোয় ধরা বাল্ব পাম্প করে কাফের চাপ আরও ২০-৩০ মিলিমিটার (যন্ত্রে পারদ স্তম্ভের উচ্চতা) বাড়িয়ে নিয়ে কনুইয়ের সামনে আগের থেকে ব্রাকিয়াল আর্টারির স্থান নির্ণয় করে রাখা অংশে স্টেথোস্কোপের 'বেল' বা শব্দ শোনার যন্ত্রাংশ হাল্কা করে রেখে কানে স্টেথোস্কোপের গোঁজার দুটো যন্ত্রাংশ ঢুকিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে (প্রমি সেকেন্ডে পারদ স্তম্ভের চাপের এককে ২ মিলিমিটার করে) 'কাফ'-এর হাওয়ায় চাপ কমাতে হবে। শুরুতে রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের কাফের চাপ রক্তচাপের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে কনুইয়ের সামনের প্রধান ধমনির রক্তস্রোত বন্ধ থাকবে। কাফের চাপ ক্রমাগত কমতে থাকায় একসময় এর চাপ যখন রক্তচাপের সর্বাধিক (সিস্টোলিক) চাপের চেয়ে কম হবে তখন ঝলকে ঝলকে রক্ত কনুইয়ের সামনের প্রধান ধমনির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত থাকবে ও কাফ দিয়ে সংকুচিত হয়ে যাওয়া ধমনির ঠিক নীচে রক্তপ্রবাহে একটা তোড় (টারবিউলেন্স) তৈরি হবে। এটা নাড়ির গতির ছন্দে 'ঠুক্‌ঠুক' করে শব্দ সৃষ্টি করবে। রক্তপ্রবাহের এই তোড়ের শব্দ স্টেথোস্কোপের কানে গোঁজার দুটো যন্ত্রাংশ দিয়ে শোনা যাবে। ঠিক এই সময় কব্জিতে আবার নাড়ির স্পন্দন অনুভূত হওয়া শুরু হয়ে যাবে। যে মুহূর্তে এই শব্দ প্রথম শোনা যাবে সেটা রক্তের সিস্টোলিক প্রেসার। রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের চাপ কমানোর চাবি নিয়ন্ত্রণ করে যন্ত্রের কাফের চাপ ক্রমশ কমাতে থাকলে একসময় এই চাপ রক্তপ্রবাহের সর্বনিম্ন চাপের চেয়েও কমে যাবে আর রক্তনালীতে কোনো চাপ না থাকায় রক্তপ্রবাহে তোড় (টারবিউলেন্স) তৈরি হবে না, কোনো শব্দও স্টেথোস্কোপে শোনা যাবে না। এই সময়ের চাপ হলো ডায়াস্টোলিক প্রেসার। সিস্টোলিক আর ডায়াস্টোলিক প্রেসার রক্তচাপ মাপার যন্ত্রে দেখে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

স্টেথোস্কোপের সাহায্যে এই রক্তচাপ মাপার পদ্ধতি সর্বোত্তম হলেও এটা প্রশিক্ষণ করার একটা পর্যায় থাকে। ডাক্তারদের প্রশিক্ষণে এটা রপ্ত করতে ছয় মাস লেগে যাওয়াটা স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের জন্য সহজে নির্ভরযোগ্যভাবে রক্তচাপ মাপার জন্য তাই 'ডিজিটাল' রক্তচাপ মাপার আধুনিক যন্ত্র জনপ্রিয়। সে ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে কেবল সঠিকভাবে যন্ত্রের 'কাফ'টা পরে নিতে হয়। কাফে হাওয়া ভরা তারপরে নিয়ন্ত্রিতভাবে হাওয়া কমিয়ে চাপ কমিয়ে স্টেথোস্কোপের শোনার কাজটাও যন্ত্র নির্ভুলভাবে করতে সক্ষম। কেবল শিখে নিতে হয়, কিভাবে আর বাহুর কোথায় কাফতে বাঁধতে হবে। এই যন্ত্রে রক্তের স্রোতের তোড় নির্ণয় করার জন্য একটা যন্ত্রাংশ (সেন্সর) থাকে, যেটাকে ব্রাকিয়াল ধমনির উপরে রাখতে হয়।

আমাদের দেশে এই সময় যে ডিজিটাল রক্তচাপ মাপার যন্ত্র শহর আর গ্রামে-গঞ্জে দেদার বিক্রি হচ্ছে, সেটা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ কিনেও নিচ্ছেন। এই যন্ত্রের কাফ বাহুতে বাঁধার কৌশলটা অনেক সহজ। ক্রয়ক্ষমতা আর প্রশিক্ষণের কথা মেনে রেখে আর রক্তচাপ মাপার সব ক'টা বৈশিষ্ট্য মেনে সঠিকভাবে রক্তের চাপ মাপা দরকার। রক্তচাপ মাপার প্রশিক্ষণ তো দূরের কথা, যেন-তেন প্রকারে রক্তচাপ মেপে সেটা ব্যবহার করলে সবসময় যে সুখের হয় না সেটা বুঝে নিতে পারলেই সঠিক রক্তচাপ মাপার প্রয়োজন ও হুজুগ আমাদের ক্ষতি করবে না।

চিকিৎসকের মাপা রক্তচাপ অনেক সময়েই বাড়ির উৎকণ্ঠামুক্ত পরিচিত পরিমণ্ডলে মাপা রক্তচাপের মানের চেয়ে কিছুটা বেশি হয়। এটাকে 'হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন' বলে থাকেন বিশেষজ্ঞ মানুষ।

হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন

ধরুন আপনি ডাক্তারের কাছে গেছেন আর আপনার বাড়িতে বসে নিজের মাপা রক্তচাপের সঙ্গে চিকিৎসকের মাপা রক্তচাপ একদম মিলছে না। আপনি তখন হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছেন, আপনি যথেষ্ট যত্নসহকারে রক্তচাপ মেপেছেন বেশ কয়েকবার। এ ক্ষেত্রে কী করা?

চিকিৎসকের মাপা রক্তচাপ অনেক সময়েই বাড়ির উৎকণ্ঠামুক্ত পরিচিত পরিমণ্ডলে মাপা রক্তচাপের মানের চেয়ে কিছুটা বেশি হয়। এটাকে 'হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন' বলে থাকেন বিশেষজ্ঞ মানুষ। ডাক্তারদের পরা প্রথাগত সাদা রঙের কোট বা আপ্রোন দেখে রোগীর রক্তচাপ বেড়ে যায় বলে আধুনিক ডাক্তাররা আজকাল আর বিশেষ আলখাল্লা পরেন না। ক্যাজুয়াল পোশাক পরেন। তবুও রক্তচাপ, নাড়ির গতি আর অজানা ভয় রোগীকে আবিষ্ট যে করে না, তেমনটা বলা যাবে না।

বিকল্প হিসাবে থাকছে রোগী নিজে বাড়ির পরিচিত পরিবেশে রক্তচাপ মেপে নিয়ে আসবেন হাসপাতালে তার চিকিৎসার জন্য। স্টেথোস্কোপ দিয়ে রক্তচাপ মাপা শেখার জন্য প্রশিক্ষণ আর অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। তাই বাজারে এলো 'ডিজিটাল রক্তচাপ মাপার যন্ত্র'। এগুলো নির্ভুলভাবেই রক্তচাপ মাপে। তবে ন্যূনতম প্রশিক্ষণের দরকার হয় এই যন্ত্রের ব্যবহারে। চিকিৎসক তার ব্যস্ত কাজের অঙ্গ হিসাবে রোগী বা সুস্থ মানুষকে শিখিয়ে দিতে পারেন বাহুর কোথায় কীভাবে ডিজিটাল রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের কাফ বাঁধতে হবে। এটাও বলে দেবেন, রক্তচাপ মাপার আগের প্রস্তুতি ও পদ্ধতি।

রোগী বা সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে রক্তচাপ মাপতে পারলেন কিনা সেই সংশয়ও অনেক সময় থেকে যায়। এই সংশয়ের সমাধানে আর একটা যন্ত্র উদ্ভাবন হয়ে গেছে, যেটা হলো ২৪ ঘণ্টা ধরে রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের প্রয়োগ (Ambulatory Blood Pressure Monitoring – ABPM)। বাহুতে এই যন্ত্র বেঁধে রোগী বা সুস্থ মানুষ একদিন কাটান – কেবল স্নান করা চলে না। যন্ত্র একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর উদাহরণস্বরূপ দিনের বেলা ৩০ মিনিট অন্তর ও রাতের বেলা ৬০ মিনিট অন্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে রক্তচাপ মেপে যন্ত্রে জমা করে রাখে। কম্পিউটার সেটার বিশ্লেষণ করে ২৪ ঘণ্টায় রক্তচাপের সংখ্যা ও তার গড় জানিয়ে দেয়। চিকিৎসকের মাপা রক্তচাপ, রোগীর নিজের বাড়িতে নিজের মাপা রক্তচাপ ও সারা দিন ধরে রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের মাপা রক্তচাপের মধ্যে একটা সম্পর্ক বৈজ্ঞানিকগণ নির্ণয় করেছেন।

সব শেষে এটা উল্লেখ না করলে অন্যায্য হবে, রক্তচাপের সংখ্যা একটা সংখ্যা মাত্র। যেভাবেই মাপা হোক না কেন, স্বাস্থ্যকর রক্তচাপের সংখ্যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের অন্তিম লক্ষ্য। এই চিকিৎসার উপরেই নির্ভর করে চিকিৎসিত ব্যক্তির দীর্ঘমেয়াদী সুস্থতা। সঠিকভাবে রক্তচাপ মাপা তাই একান্ত জরুরি।

ডায়াবেটিস ও গ্লুকোমিটার

ডায়াবেটিস – যাকে বাংলায় মধুমেহ রোগ বলে, আজকাল ঘরে ঘরে। রক্তে শর্করা, গোদা বাংলায় বললে চিনির পরিমাণ বেড়ে যাওয়াই এই রোগের দস্তুর। যার রাশ টানতে না পারলে হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, বৃক্ক, চোখ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিকল হয়ে যেতে পারে। এই রোগে নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা জরুরি। এখন পাড়ায় পাড়ায় প্যাথলজিক্যাল ল্যাব। এমনিতে অসুবিধা নেই। তবে যারা রোগাক্রান্ত তারা রক্ত পরীক্ষার ব্যাপারটা ঘরে বসেই সেরে ফেলতে পারেন। তা নিয়েই দু'চার কথা এই প্রতিবেদনে।

প্রস্তাবনা

গ্রামেগঞ্জে না মিললেও শহরে ওষুধের দোকানে দুই-আড়াই হাজার টাকায় রক্তের সুগার মাপার নির্ভরযোগ্য যন্ত্র – যার চলতি নাম

'গ্লুকোমিটার' কিনতে পাওয়া যায়। এককভাবে কিনতে না চাইলে, পাড়া বা ক্লাবের সদস্যরা চাঁদা তুলেও কিনতে পারেন। এটা দিয়ে ঘরে বসেই সস্তায় নির্ভরযোগ্যভাবে রক্তে শর্করা নির্ণয় করা যায়। প্রতিটি পরীক্ষার জন্য একটি করে রাসায়নিক মাখানো প্লাস্টিকের পাতা (স্ট্রিপ) লাগে, যার প্রতিটির দাম ২০-২৫ টাকা। রক্ত শর্করা মাপতে এক ফোঁটা রক্তই যথেষ্ট। যার জন্য পিন (ল্যান্সেট) বা ইনজেকশনের সূঁচ লাগে। একটা প্যাকেটে বা শিশিতে ১০, ১৫ বা ৫০ টেস্ট স্ট্রিপ থাকে। প্যাকেট খুললে মোটামুটি তিন মাসের মধ্যে ব্যবহার করে নিতে হয়। কারণ বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প টেস্ট স্ট্রিপকে অকেজো করে দিতে পারে। ল্যাবরেটরিতে সুগার পরীক্ষার জন্য ৭০ থেকে ১৫০ টাকা লাগে, সঙ্গে বাড়ি থেকে ল্যাবরেটরিতে বার দুই আসা-যাওয়ার খরচ। ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরির রিপোর্টের চেয়ে বাড়িতে আঙুলে পিন ফুটিয়ে রক্ত বের করে 'ক্যাপিলারি ব্লাড গ্লুকোজ (CBG)' বা স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রে মেপে নেওয়া বেশি কাজের বলে বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ হিসাবে জানাই – সুগার পরীক্ষার আগে দুই ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোলসা করে নেওয়া প্রয়োজন। খামোখা রক্তে সুগারের মাত্রা কেন জানতে চাইব? এটা ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ের অঙ্গ। তবে জেনে রাখা জরুরি – ডায়াবেটিস আপাত সুস্থ মানুষের গ্লুকোমিটার দিয়ে নিজের রক্তের সুগারের মাত্রা পরীক্ষা যথার্থ নয়। তাঁদের প্রথাগত ল্যাবরেটরির উপরে নির্ভর করতে হবে। ডিজিটাল গ্লুকোমিটারে পরীক্ষা কেবল ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সুগারের মাত্রা জেনে ডাক্তারকে ওষুধের অদলবদলে সাহায্য করে।

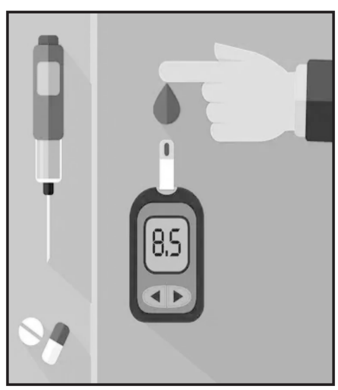

কারা 'ডিজিটাল' যন্ত্রে পরীক্ষা করবেন?

ঠিক চিকিৎসার ওষুধপত্র এবং ইনসুলিনের নির্বাচন ও তার মাত্রা নির্ধারণের জন্য ডায়াবেটিস আক্রান্তদের নিয়মিতভাবে জীবনভর এই যন্ত্রের সাহায্যে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা জেনে লিখে রাখতে হয়। এক-দু'বার পরীক্ষার ব্যাপার হলে এর দরকার হতো না। এটা উচ্চ রক্তচাপের রোগীর নিয়মিত রক্তচাপ মাপার সঙ্গে তুলনীয়। ঘরে বসে সুগার মেপে নেওয়াটা তাই সস্তা আর স্বস্তিরই নয়, বেশি কাজের।

গ্লুকোমিটারে নিজে গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয়

প্রথমে সাবান ও গরম জলে হাত ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। আঙুলের ডগা থেকে রক্ত বের করার জন্য ফোঁটানোর যন্ত্র যেটা ল্যান্সিং ডিভাইস নামে পরিচিত, তাতে নতুন পিন বা ল্যান্সেট জুড়তে হবে। একটা পিন একই ব্যক্তি একাধিক বার ব্যবহার করতে পারেন। তবে বারবার ব্যবহারে পিনটি ভোঁতা হয়ে গিয়ে বেশি ব্যথা লাগে।

আঙুলের ডগার মাঝখানের চেয়ে ধারের দিকে কম স্নায়ু থাকায় ধারে পিন ফোটালে ব্যথা কম লাগবে। আঙুলের বদলে কবজির উপরে সামনের দিকেও পিন ফোটানো যায়। রক্ত বের করার জন্য জায়গাটাকে সাবান দিয়ে ধুয়ে, শুকিয়ে হাত দিয়ে বারবার ঘষে রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে নিতে হবে – যাতে পিনের আলতো খোঁচায় এব ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে আসে। শীতকালে হাতের রক্তনালী সরু হয়ে যায়। প্রবীণদের অসুবিধা হয়। এমনটা হলে গরম জলে হাত ধুয়ে নিলে কাজটা সহজ হয়।

বাজারে অজস্র গ্লুকোমিটার, তেমনি অজস্র টেস্ট স্ট্রিপের শিশি বিক্রি হয়। ছিপি একবার খুললে শিশির সমস্ত স্ট্রিপ দুই বা তিন মাসের মধ্যেই ব্যবহার করে নিতে হবে। এটা ব্যবসায়িক চাল। প্রস্তুতকর্তারা চাইলেই এক একটা স্ট্রিপ আলাদাভাবে বায়ুনিরোধক প্যাকেটে ভরে বাজারে ছাড়তে পারেন।

পিনের খোঁচায় রক্ত আঙুলের ডগায় বেরিয়ে এলে টেস্ট স্ট্রিপের রাসায়নিক মাখানো প্রান্ত সেই রক্তের ফোঁটায় স্পর্শ করালে কৈশিক আকর্ষণে (ক্যাপিলারি অ্যাকশনে) রক্ত স্ট্রিপে মিশে যাবে ও গ্লুকোজের মাত্রা অনুযায়ী স্প্রিটের রাসায়নিক প্রান্ত এক বিশেস মাত্রার বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে।

এবার রক্ত মাখানো স্ট্রিপ গ্লুকোমিটারের নির্দিষ্ট খোপে ঢোকালেই যন্ত্র গ্লুকোজের মাত্রা দেখিয়ে দেবে। এই মাত্রা, ব্যবহৃত সুগারের ওষুধের বিবরণ, তারিখ, সময়, না খেয়ে বা শেষ খাওয়ার কতক্ষণ পরে এই মাত্রা নির্ণীত হলো তা লিখে রাখতে হবে। দামি গ্লুকোমিটারে তথ্য জমা রাখার উপায় থাকে। তবুও কাগজে লিখে রাখা জরুরি।

গ্লুকোমিটারে বাড়িতে সুগার মাপা কতটা নির্ভরযোগ্য?

বাজারে যে গ্লুকোমিটার বিক্রয় হয় সেগুলো ভরসাযোগ্য। দুটো যন্ত্রের ফলাফলেও তেমন পার্থক্য হয় না। যন্ত্রে অবিশ্বাস্য ফল দেখালে সেটা ভুল মনে করার কারণ নেই। প্রয়োজনে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ল্যাবরেটরিতে শিরার রক্তের সুগারের মাত্রা জানা যায় আর গ্লুকোমিটারে ক্যাপিলারি। স্কুলে পড়া রক্তের প্রবাহ পথ মনে করুন। দেখবেন রক্তজালিকায় শিরার থেকে খানিকটা বেশি

গ্লুকোজ থাকা স্বাভাবিক। দুই পদ্ধতির ফলাফলে সুগারের মাত্রায় ১৫ শতাংশ ফারাক স্বাভাবিক। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ কোনো শারীরিক সমস্যার কারণ নেই বটে। তবে অনেক কম হলে সাধারণত কিছু শারীরিক সমস্যা হওয়াটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ শারীরিক সমস্যা নেই, তেমন ক্ষেত্রে গ্লুকোমিটারের পরীক্ষায় বেশ কম সুগারের মাত্রা নির্ণয় হলে ফের ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অনেক কমে গেলে গ্লুকোমিটার ততটা নির্ভুলভাবে দেখাতে পারে না। মাঝে মধ্যে তাই ল্যাবরেটরিতে মাপার সময় সঙ্গে গ্লুকোমিটারটা নিয়ে গিয়ে যাচাই করে নেওয়া উচিত। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত প্রবীণদের অনেক সময় দৃষ্টির সমস্যা থাকে। তাঁদের জন্য 'কথাবলা' গ্লুকোমিটার পাওয়া যায়। সেটা ফল দেখানোর সঙ্গে সংখ্যাটাও বলে দেয়।

কারা গ্লুকোমিটার ব্যবহার করবেন?

ডায়াবেটিস চিকিৎসার অন্যতম লক্ষ্য হলো রক্তে গ্লুকোজ স্বাস্থ্যকর মাত্রার মধ্যে রাখা। অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর খাবার, শরীরচর্চা ও ওষুধের মাধ্যমে জীবনভর গ্লুকোজের মাত্রা নির্দিষ্ট রাখা। চিকিৎসার জন্য সুগারের মাত্রা বারবার মাপতে হয়। হৃদরোগ, রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মতো কয়েকটা অনিরাময়যোগ্য 'ক্রনিক' রোগে ওষুধ নির্বাচনে আর তার মাত্রা নির্ধারণে কেবল একবার রক্তচাপ ও গ্লুকোজ ইত্যাদি মাপলেই চলে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে রোগের মাত্রাও বাড়তে থাকে। তাছাড়া আমাদের খাদ্য নির্বাচনে, খাবার পরিমাণে, শরীরচর্চার ঘাটতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে একই ওষুধ খেয়ে গেলেও সুগারের মাত্রা একই থাকে না। আগে যে ওষুধে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর সীমার মধ্যেই ছিল, সেটা চুপিসারে শরীরকে কোনো ইঙ্গিত না দিয়েই বেড়ে গিয়ে গোপনে কিডনি, চোখ, স্নায়ু ইত্যাদির ক্ষতি করতে থাকে। ঘটনা হলো, প্রাথমিক পর্যায়ে এই ক্ষতি টের পাওয়া যায় না। ৬০-৮০% ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর যখন টের পাওয়া যায়, তখন বড় দেরি হয়ে যায়। তলায় তলায় বেড়ে গিয়ে ক্ষতি ঠেকাতেই নিয়মিত রক্তের মাত্রা চিকিৎসককে জানাতে হয়। যাতে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয়ের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তিনটি উপায় আছে – ১. প্রথাগত ল্যাবরেটরির রক্ত পরীক্ষা, ২. গ্লুকোমিটারে ঘরে বসে পরীক্ষা, ৩. শরীরে অস্ত্রোপচার করে ঢোকানো 'স্বয়ংক্রিয় ও নিরবচ্ছিন্নভাবে রক্তের গ্লুকোজ মাপার যন্ত্র'। শেষেরটা কেবল জ্ঞানের জন্য, যা আমাদের দেশে আপামর মানুষের ক্ষেত্রে মোটেই প্রাসঙ্গিক নয়। এই যন্ত্রের ইংরেজি নাম 'কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং' বা CGM। এতে রোগীর রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা বাড়া কমার সঙ্গে যন্ত্র তার সঙ্গে থাকা ইনসুলিনের ভাঁড়ার থেকে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখে। এটা পদ্ধতি হিসাবে ভাল। তবে আমাদের দেশে এই প্রযুক্তি অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ।

ডায়াবেটিসের রোগীর চিকিৎসার মূল্যায়নের আর একটি পরীক্ষা রক্তে গ্লাইকোসিলেটেড হিমোগ্লোবিনের (HbA1c) মাত্রা নির্ধারণ। এই পরীক্ষা ডায়াবেটিস রোগীর সবচেয়ে উন্নত মূল্যায়ন তাঁর দীর্ঘমেয়াদী সুস্থতার জন্য। তবে এটিও কিঞ্চিৎ জটিল। বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষাগারেই এই পরীক্ষা করা উচিত। এটা সস্তা নয়। এই পরীক্ষায় খালি পেট বা ভরা পেটের সমস্যা নেই। রক্তের গ্লাইকোসিলেটেড হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ক্ষণিকের রক্তের অস্বাভাবিক উচ্চ বা নিম্ন মাত্রা প্রভাবিত করে না। বরং এটা গড় আভাস দেয়। এই পরীক্ষা যেদিন করা হচ্ছে, তার তিন মাসের আগের থেকে সেই দিন অবধি রক্তের গড় গ্লুকোজের মাত্রার আভাস দেয়। ডায়াবেটিসে আক্রান্তের চোখ, কিডনি আর স্নায়ুর ক্ষতিসাধনের (Microvascular complecation) ইঙ্গিত দেয়। যা থেকে চিকিৎসক সঠিক ওষুধের নিদান দিতে পারেন।

স্থানীয় পরীক্ষাগারে, ওষুধের দোকানে বা সাইকেলে চলমান দালালের মারফতে সহজেই রক্তের সুগারের মাত্রা পরীক্ষা করে নেওয়া যায় – সেটাই জনপ্রিয় ও সস্তা। তবে এটা মনে রাখতে হবে, রক্ত পরীক্ষা আপনার শরীরের যত্নের কর্মকাণ্ড। তাই এর সঙ্গে কোনো আপস নয়। বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করুন। প্রয়োজনে একটু কষ্ট করে হলেও আপনার বিচারে শ্রেষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য পরীক্ষাগারে যান।

ডায়াবেটিস হলে কত ঘন ঘন পরীক্ষা?

প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি দিনের বিভিন্ন সময়ে অভুক্ত অবস্থায় ও খাবার পরে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের যত কাছাকাছি রাখতে পারবেন, তার চোখ, কিডনি আর স্নায়ু তত দীর্ঘদিন স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা নিয়ে কাজ করবে। প্রতিদিন অন্তত দিনের পাঁচ-ছয় রকমের সময়ে গ্লুকোজের মাত্রা মাপা দরকার – সকালে অভুক্ত অবস্থায়, দুপুরে ও রাতে খাবার আগে আর সকালে, দুপুর আর রাতে খাবার দুই ঘন্টা পরে রক্তের সুগারের মাত্রা আপনার ডাক্তার জানতে পারলে তিনি সবচেয়ে কার্যকরী নিদান দিতে পারেন। তবে ৩৬৫ দিন রোজ পাঁচ/ছয়বার আঙুল ফুটিয়ে রক্ত বের করে তার গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয় করে সেটা তার ডায়েরিতে লিখে রাখবেন – এমন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষ পাওয়া ভার। তাই একটা আপস করতেই হয়। সেটা চিকিৎসক যেমন বলবেন, সেটা করাই ভালো। গ্লাইকোসিলেটেড হিমোগ্লোবিন বা ছোট করে বললে গ্লাইকেটেডে হিমোগ্লোবিন (HbA1c) পরীক্ষা ডায়াবেটিসের চিকিৎসা মূল্যায়নের একটা পরিপূরক পরীক্ষা, বিকল্প নয়।

টাইপ-১ মানে ইনসুলিন নির্ভর ডায়াবেটিসের আলোচনা ক্ষণিকের জন্য মুলতবি রেখে টাইপ-২ অর্থাৎ ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ সুগারের রোগীর কথা ভাবা যাক। ইনসুলিন অনির্ভর টাইপ-২ ডায়াবেটিসের রোগীর চিকিৎসার মূল্যায়নের জন্য কত ঘন ঘন রক্তের সুগারের অর্থাৎ গ্লুকোজের মাত্রা মাপতে হবে সেটা

রোগীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য – কেবল সুগারের টেবলেটেই চিকিৎসা করা যাচ্ছে না ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হচ্ছে, তাঁর জীবনশৈলী, গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিনের মাত্রা আর রক্তের সুগার কমে গিয়ে আতঙ্কের 'হাইপোগ্লাইসেমিয়া' নামের অভিজ্ঞতা হচ্ছে কিনা সেটা বিবেচনা করে চিকিৎসক কত ঘন ঘন রক্তের সুগার মাপতে হবে সেটা বলে দেন। উন্নত দেশে রোগী প্রতিদিন চারবার করে গ্লুকোজের মাত্রা ঘরে বসে মেপে ডায়েরিতে লিখে রাখেন। আমাদের দেশে চিকিৎসক রোগীর সচেতনতা আর সামর্থ্য বিচার করে একজন স্থিতিশীল ডায়াবেটিসের রোগীকে সপ্তাহে ছয়বার সুগারের পরীক্ষা করতে – প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন আর রাতের খাবারের আগে এবং এই তিন ভোজনের দুই ঘণ্টা পরে রক্ত পরীক্ষা করতে বলতে পারেন। এটা একই দিনে না হলেও চলবে। আপর করতে হলে প্রতি সপ্তাহে না করতে পারলে প্রতি পক্ষে অন্তত অথবা প্রতি মাসে করতে হবে।

হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা রক্তশর্করাস্বল্পতা

ডায়াবেটিস রোগীর সুগারের মাত্রা হঠাৎ স্বাভাবিক সীমার নীচে নেমে বিপত্তি ঘটায়। যাকে বলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা রক্তশর্করাস্বল্পতা (Hypoglycemia)। এতে অনেক সময় রোগীর প্রায় যমের মুখ থেকে ফিরে আসার অভিজ্ঞতাও হয়। এই অবস্থা ঠেকাতে চিকিৎসকরা সচেতনতা ও কৃচ্ছ্রসাধনের ওপর জোর দেন। বলেন : বেশি পরিমাণের অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়ানোর মতো অত্যন্ত প্রয়োজন সময়মতো ন্যূনতম খাবার গ্রহণ করা দরকার। কোনো অজুহাতে খাবার সময় পিছানো চলবে না বা প্রয়োজনের চেয়ে কম পরিমাণের খাবার খাওয়া চলবে না। সুস্থ মানুষের রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক সীমার মধ্যে রাখার যে জৈবিক ক্রিয়া সক্রিয় থাকে সেটা ডায়াবেটিসের রোগীর ক্ষেত্রে বিকল থাকে। তাই রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক সীমার মধ্যে রাখার জন্য আক্রান্ত মানুষের জন্য সচেতনে ওষুধ ব্যবহারের সাথে সাথে সময়মতো সঠিক পরিমাণের খাবার খাওয়ার জন্য আলাদা করে মাথা খাটাতে হয়। যে ডায়াবেটিসের রোগী এক বা একাধিকবার দুঃস্বপ্নসম রক্তের সুগারের মাত্রা কমে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর ক্ষেত্রে গ্লুকোমিটার দিয়ে ঘন ঘন নিজের সুগারের মাত্রা মেপে সেটা লিখে রাখা জরুরি। তারিখ, সময়, অভুক্ত বা খাবার কত সময় পরে সেটা মাপা হলো আর সেই সময়ে সুগারের কোন্ কোন্ ওষুধ কত মাত্রায় চালু আছে সেটা লিখে রাখবেন। এই তথ্য চিকিৎসক ব্যবহার করে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সম্ভাবনা দূর করে আরও নিখুঁত নিদান দিতে পারবেন।

ইনসুলিন না ওষুধ – কোনটার খরচ কম

ডায়াবেটিস রোগের তীব্রতা বয়সের সঙ্গে বাড়তেই থাকে। নিয়মিত শরীরচর্চা না করলে, খাদ্যশৃঙ্খলা না মেনে চললে রোগের শুরুর বশে কয়েক বছর পরে রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এর একটা কারণ হয়তো আজকাল ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগী আগের জমানার চেয়ে অনেক দিন বেশি বাঁচেন। রোগ পুরনো হলে একসময় ওষুধের মাত্রা বাড়ানো আর নতুন আবিষ্কৃত ওষুধের প্রয়োগ এবং/অথবা ইনসুলিন ইনজেকশনের ব্যবহার করতেই হয়। দামের দিক দিয়ে ডায়াবেটিসের নতুন ওষুধগুলো বেশ খরচের। অনেক সময় ইনসুলিনের চেয়েও দামি। এক্ষেত্রে রোগীর ক্রয়ক্ষমতা আর ইনজেকশনে অনীহার মধ্যে একটা আপস করা যায় কিছুকাল পর্যন্ত। একসময় ইনসুলিন ছাড়া চলে না, যেমন কিডনির অসুখ শুরু হয়ে গেলে।

ইনসুলিনে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে, ওষুধে উল্টো

এই প্রশ্নের উত্তর কিঞ্চিৎ জটিল। পরিণত বয়সের ডায়াবেটিসে বেশ কিছু ওষুধ ইনসুলিনের চেয়ে বেশি উপকারী – যেমন মেটফরমিন। টাইপ-২ অর্থাৎ পরিণত বয়সের যে ডায়াবেটিস রোগ, যেটা মোট ডায়াবেটিস রোগের ৯৫ শতাংশের বেশি, তাতে প্রাকৃতিকভাবে শরীরে প্রস্তুত ইনসুলিন (যেটা স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বেশিও হতে পারে, Hyperinsulinaemia), তার কর্মক্ষমতা হারায় ইনসুলিনে সংবেদনতার অভাবে। মেটফরমিন নামের পুরনো ও সস্তা ডায়াবেটিসের ওষুধটি দেহকোষে রোগীর শরীরে উপলব্ধ ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা বাড়ায় অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে ও প্রামাণ্যভাবেও ইনসুলিনের চেয়ে উৎকৃষ্ট। আবার ডায়াবেটিসের সাথে হার্ট ফেলিওর (হৃদস্পন্দনে রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা হ্রাস পেলে) SGL2 inhibitors (Empaglifazone, Dapagligazone) বিশেষ কাজের, যেটা ইনসুলিন করতে পারে না।

▲**গণস্বাস্থ্য**

উৎস মানুষ, জানুয়ারি-মার্চ ২০২১
উৎস মানুষ, এপ্রিল-জুন ২০২১

তথ্যসূত্র :
চিকিৎসকের মাপা, ডিজিটাল যন্ত্রের দ্বারা রোগী বা সুস্থ মানুষের নিজের মাপা ও সারা দিনের রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের সাপা রক্তচাপের পারস্পরিক সম্পর্ক।
Reproduced from: Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/ APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: A report of the American College of Cardiology/ American Heart Association task force on clinical practice guidelines. J Am Coll Cardiol 2017.

[নিজের চিকিৎসা কিঞ্চিৎ নিজে করার আরো পদ্ধতি আছে। লেখক এখানে অল্প কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। পরবর্তীতে আরো কিছু বিষয়ের উপর আলোচনা করা হবে। ডাক্তার-নির্ভরতা আসল কথা নয় – ঘর থেকেই শুরু হতে পারে আমাদের চিকিৎসা। – স. [

PHARMA TRADING INTERNATIONAL

Your Reliable Global Partner

* EXPORTER * IMPORTER * INDENTOR * SUPPLIER OF GENERAL MERCHANDISE

BULK COMMODITIES, HEAVY EQUIPMENTS, CHEMICALS & ALL KINDS OF PACKING MATERIALS

Pharmaceuticals

- Raw Materials
- Packaging Materials
- Excipients

Pharma Trading International

House # 11, Road # 25, Block-D, Section-11, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh

Mobile : 01818407419, 01758306486, E mail : pharmatrading_int@hotmail.com & pharmatrade_inl@outlook.com

চাপে প্রলোভনেও সোচ্চার জাফরুল্লাহ চৌধুরী

এনাম আবেদীন

দেশে ব্যাপক আলোচিত নাম ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। কেউ মনে করেন তিনি রাজনীতিবিদ, কারো কাছে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের রূপকার, আবার কেউ মনে করেন, তিনি সমাজের সব অসংগতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

কিন্তু এই প্রতিবাদ যখনই কোনো ব্যক্তি বা দলের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, তখনই তারা একে 'পাগলামি' বলে আখ্যায়িত করে। **ষাটের দশকে ঢাকা মেডিক্যালের ছাত্র থাকা অবস্থায় সেই প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন তথা 'পাগলামি কর্মকাণ্ড' করে বসেন ডা. জাফরুল্লাহ। বর্তমান সময়েও তাঁর 'সত্য বচন' অনেকের কাছে পাগলামি বলে মনে হয়।**

জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনে ভূমিকা পালন করায় এবং করোনার টিকা নিয়ে কথা বলায় জাফরুল্লাহর বিরুদ্ধে ছিল আওয়ামী লীগ। আবার এখন তারেক রহমানকে দুই বছরের জন্য রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়ায় তাঁর কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ করছে বিএনপি। কিন্তু বীর মুক্তিযোদ্ধা জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে এসব ঘটনা দমাতে পারেনি। যে চেতনা ও সাহস তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাগিদ জুগিয়েছে, তেমনি দূরদর্শী প্রতিভা তাঁকে নিয়ে গেছে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ভাবনা ও পরিকল্পনার দিকে। এ কারণেই মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৪৮০ বেডের ফিল্ড হাসপাতাল নির্মাণ, পরিবার পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে লাইগেশন সার্জারির উদ্ভাবন এবং এরশাদ আমলে ১৯৮২ সালে জাতীয় ঔষধ নীতি প্রণয়নের মতো কাজ তিনি করতে পেরেছিলেন। লন্ডনে নিজের পাসপোর্টে আগুন লাগিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতার প্রতিবাদ জানানোর ইতিহাসও তিনি।

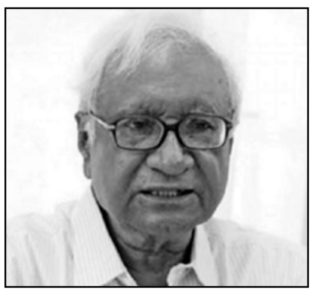

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

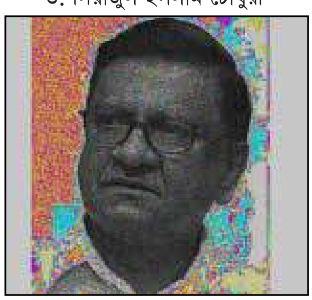

অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক

বাংলাদেশে সম্ভবত ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীই একমাত্র ব্যক্তি, মুক্তিযুদ্ধের পর যাঁর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়াসহ দেশের বেশির ভাগ রাজনীতিকের ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক ছিল। কিন্তু ওই সম্পর্ক ব্যবহার করে ডা. জাফরুল্লাহ ব্যক্তিগত বা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন এমন উদাহরণ কেউ দিতে পারবেন না।

ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষায়, 'অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই হচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহর জীবনের চালিকাশক্তি। তাঁকে এই সমাজের বাতিঘরও বলা যায়। কেননা মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে গত পাঁচ দশকের সব রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। প্রতিবাদী ও একজন সংগঠকের ভূমিকায় আমরা তাঁকে দেখি।'

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, 'ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক নন। তিনি যখন যা-ই বলেন সেটি তাঁর বিবেচনাবোধ থেকে। নিজের স্বার্থ বা উপার্জনের কথা চিন্তা করে তিনি কথা বলেন না। সত্য বলায় শুভাকাঙ্ক্ষীদের কোনো নিষেধও তিনি শোনেন না।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক মনে করেন, 'জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মধ্যে অসাধারণত্ব আছে এবং তিনি সঠিক ও সত্য কথাই বলেন। এই সত্যের হিসাব যখন কারো অপছন্দ হয়, তখনই তারা পাগলামির প্রসঙ্গটি ভাবতে থাকে।' তিনি বলেন, তাঁর মতো সাহসী ও প্রতিবাদী মানুষকে আওয়ামী লীগ বা বিএনপির লোক না বলাই ভালো। কারণ তিনি জন-আকাঙ্ক্ষার দিকে তাকিয়ে সহজ-সরলভাবে মত প্রকাশ করে থাকেন।

সম্প্রতি 'কালের কণ্ঠ'র সঙ্গে দীর্ঘ আলাপে জাফরুল্লাহ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণসহ স্বাধীনতা-পরবর্তী কয়েকজন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে স্মৃতিচারণা করেন। তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকার বিএনপিকে ধ্বংস করতে গিয়ে কার্যত রাজনীতিকেই ধ্বংস করেছে। এ জন্য দেশে হিংসা-বিদ্বেষ তৈরি হয়েছে। রাজনীতি থেকে এই হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার জন্য আমি এখনো দুই দলের মধ্যে এটা সমঝোতার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাচ্ছি না। এক দল আমলা তাঁকে ঘিরে রেখেছে।'

জাফরুল্লাহ জানান, ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ দেখা হয়েছিল। এর আগে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার পর এবং ড. ওয়াজেদ মিয়ার মৃত্যুর পরও তিনি শেখ হাসিনার বাসায় গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় আহত নেতাকর্মীদের চিকিৎসায় সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে শেখ হাসিনা নিজেই তাঁকে ডেকে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন বলেও জানান ডা. জাফরুল্লাহ। তিনি বলেন, 'দেশে রাজনৈতিক বিভাজনের এই সময়ে একজন অভিভাবকের বড় অভাব।'

এরশাদবিরোধী আন্দোলনে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে আলোচনার টেবিলে বসানোয় নেপথ্যে মূল ভূমিকা রেখেছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রয়াত ফয়েজ আহমেদ। এর পরের কয়েক দশকে প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হককে দুই নেত্রীর সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে। তাঁর মৃত্যুর পর দুই নেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকা সর্বশেষ মানুষটি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলে অনেকে মনে করেন। কারণ দুই নেত্রীর সঙ্গে তাঁর একাধিকবার দেখা হয়েছে, বৈঠকও করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে যায় এমন কথা বলে আবার তাঁদের বিপদে পাশেও দাঁড়িয়েছেন। এরশাদ আমলে খালেদা জিয়াকে গ্রেপ্তার করা হলে তাঁকে দ্রুত মুক্তি দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এখন আবার খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানাচ্ছেন। যদিও বর্তমান রাজনৈতিক বৈরিতা দূর করতে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও তিনি সফল হতে পারেননি। তবু তিনি থেমে নেই। অদম্য এই মানুষটি ৮০ বছর বয়সেও রাজনীতিসহ জাতীয় প্রায় প্রতিটি ইস্যুতে তৎপর রয়েছেন, প্রতিবাদ করছেন।

বেগম খালেদা জিয়া

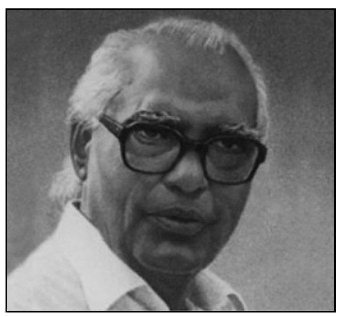
ফয়েজ আহমদ

ব্যারিস্টার রফিকুল হক

গত কয়েক বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দুই দফা খোলা চিঠি দিয়ে আলোচিত হয়েছেন ডা. জাফরুল্লাহ। যদিও ওই চিঠির বিষয়ে দুই নেত্রীর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ডা. জাফরুল্লাহর কিছু মতামত ও তৎপরতাকে 'পাগলামি' বলে অভিহিত করেছেন। দু-একটি লেখায় তাঁকে 'বিএনপির অভিভাবক' বলেও অভিহিত করেন তিনি।

এর মূল কারণ হলো জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনে ভূমিকা পালন করেছিলেন জাফরুল্লাহ। **এই জাফরুল্লাহর পরামর্শেই যে ১৫ আগস্ট খালেদা জিয়া কেক কাটা বন্ধ করেছেন সেটি অনেকেরই জানা নেই। শুধু তা-ই নয়, খালেদা জিয়ার ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুর পর ২০১৫ সালের ২৫ জানুয়ারি গুলশান কার্যালয়ে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত বিএনপি নেতাদের অনুরোধ করেছিলেন।** কিন্তু নেতাদের একটিই কথা ছিল, পত্রিকায় হেডিং করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে শেখ হাসিনা আসছেন। তাঁর অনুরোধ উপেক্ষিত হলে তিনি গুলশান কার্যালয় ত্যাগ করেন। পরে কার্যালয়ের ফটক বন্ধ করে দেওয়া হলে শেখ হাসিনা সেদিন ফিরে যেতে বাধ্য হন।

ওই দিন খালেদা জিয়া খবর দিয়ে জাফরুল্লাহকে ডেকে নিলেও শেষ পর্যন্ত উপস্থিত গুলশান কার্যালয়ে কর্মকর্তারা তাঁকে দেখা করতে দেননি। বলা হয়েছিল, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। এ প্রসঙ্গে জাফরুল্লাহ চৌধুরী কালের কণ্ঠকে জানান, 'ওই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর খালেদা জিয়া আবারও আমাকে ডেকে পাঠান। সেদিন গিয়ে আমি ফিরে এসেছি বলে জানালে খালেদা জিয়া বলেন, আপনি এসেছিলেন এ কথা আমাকে কেউ জানায়নি।' প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'খালেদা জিয়াও আমাকে বলেন, পত্রিকায় হেডিং করার জন্য প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে বলেছি যে সেটা হয়তো সত্য। কিন্তু আপনি তখন বলতে পারতেন যে আমার ছেলে তারেককে আমার কাছে এনে দেন। তাহলে আপনিই হেডিং হয়ে যেতেন।'

তারেক রহমানের বদলে তাঁর স্ত্রী ডা. জোবায়দা রহমান অথবা তাঁর মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমানকে বিএনপির নেতৃত্বে আসার পরামর্শ দেওয়ায় ইদানীং জাফরুল্লাহর কর্মকাণ্ডকে আড়ালে পাগলামি বলছেন বিএনপির অনেকেও। অথচ জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনে ভূমিকা পালনের জন্য সরকারের কাছে এই জাফরুল্লাহই আবার ব্যাপকভাবে সমালোচিত (কারো কারো মতে শত্রুও)। ঐক্যফ্রন্ট করার কারণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে হামলা এবং মামলা পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু এসবের থোড়াই কেয়ার করেন ডা. জাফরুল্লাহ। এখনো তিনি সরকারের বিরুদ্ধেও বলেন, বিএনপির বিরুদ্ধেও বলেন।

সর্বশেষ গত ২৬ জুন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে ছাত্রদলের কয়েক নেতার বাধার মুখে পড়েন জাফরুল্লাহ। অথচ এ নিয়ে তাঁর বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'ওরা ছেলে মানুষ, কী বলেছে এটা বড় বিষয় নয়।'

জাফরুল্লাহ জানান, যত দিন তিনি বেঁচে থাকবেন, তাঁর চোখে ধরা পড়া অসংগতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে যাবেনই। কারণ তাঁর হারানো বা চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। তাঁর ভাষায়, 'অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী দলকানা হয়ে গেছেন। আবার যাঁরা আছেন, তাঁরা উদ্যোগী নন। সাহস হারিয়ে গেছে। হতাশ। বলছেন, এ দেশে আর কিছু হবে না। কিন্তু শূন্যতা পৃথিবীর ধর্ম নয়। পরিবর্তন হঠাৎ করেই হবে।'

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছাত্রজীবন থেকেই প্রতিবাদী। তাঁর বাবার শিক্ষক ছিলেন বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেন। ষাটের দশকে ঢাকা মেডিক্যালে ছাত্র থাকার সময়ই সেই মেডিক্যালের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করে জাফরুল্লাহ আলোচিত হন। এরপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এফআরসিএস চূড়ান্ত পর্ব শেষ না করেই লন্ডন

থেকে তিনি ভারতে চলে আসেন। সেখানে আগরতলা মেলাঘরে গেরিলা প্রশিক্ষণ নেন। এরপর ডা. এম এ মবিনের সঙ্গে মিলে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য সেখানেই ৪৮০ শয্যার ‘বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল’ প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশের মানুষকে কম পয়সায় চিকিৎসা দিতে সাভারে আজকের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতালটি স্বাধীনতার পর তিল তিল করে তিনি গড়ে তোলেন। হাসপাতালটির নাম ‘গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র’ দিয়েছেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কেন্দ্রটির জন্য ৩১ একর জমি বরাদ্দ তাঁরই দেওয়া। **বাংলাদেশ আজকে যে ওষুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ এটি ডা. জাফরুল্লাহর অবদান। এরশাদ সরকারের সময়ে ১৯৮২ সালে তাঁরই প্রণীত ‘জাতীয় ঔষধ নীতি’ স্বাস্থ্য খাতে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ ওই নীতির ফলে চাহিদার ৯০ শতাংশ ওষুধই এখন দেশে তৈরি হচ্ছে এবং বাংলাদেশ আজ একটি ওষুধ রপ্তানিকারণ দেশ।**

কিন্তু বিড়ম্বনার বিষয় হচ্ছে, বিএনপির সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাফরুল্লাহর আজ সম্পর্কের টানাপড়েন তৈরি হয়েছে। অথচ এরশাদ আমলের ওষুধ নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় বিএনপি সরকারের সময় ১৯৯২ সালে তৎকালীন বিএমএ তাঁর সদস্য পদ বাতিল করে। এমনকি ওই সময় তাঁর ফাঁসি চেয়ে পোস্টারও লাগানো হয়।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জাফরুল্লাহ চৌধুরীর অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকারকে এ বিষয়ে তিনি উৎসাহিত করেন। বঙ্গবন্ধুর কাছে তিনি প্রস্তাব করেন যে প্রথমে পুরুষদের বন্ধ্যাকরণ করতে হবে। কিন্তু তার এ প্রস্তাব বঙ্গবন্ধু হাসতে হাসতে উড়িয়ে দেন। পরে তিনি লাইগেশন সার্জারির উদ্ভাবন করেন। তাঁর এ সংক্রান্ত পেপারটি বিশ্ববিখ্যাত মেডিক্যাল জার্নাল ‘ল্যানসেট’-এ মূল আর্টিকেল হিসেবে ছাপা হয়। ১৫০ বছরের মধ্যে এটিই প্রথম কোনো বাঙালির ল্যানসেটে ছাপা আর্টিকেল। স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৮৫ সালে তিনি বিকল্প নোবেল খ্যাত ‘র‌্যামন ম্যাগসেসাই’ পুরস্কার লাভ করেন।

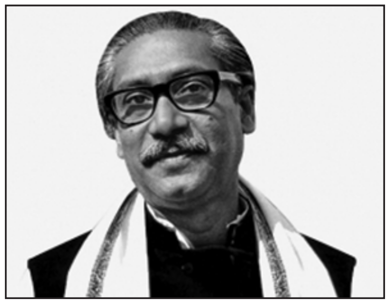
শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা

এম ওয়াজেদ মিয়া

ডা. জাফরুল্লাহর প্রণীত ওষুধনীতি দেশে-বিদেশে এতটাই প্রশংসিত হয় যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তাঁকে আমন্ত্রণ করে ভারতে নিয়ে যান এবং ভারত কীভাবে ওষুধ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে তার পলিসি নির্ধারণ করে দেওয়ার অনুরোধ করেন।

এ প্রসঙ্গে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, ‘সম্ভবত ১৯৮৮ সালের দিকে তিনি কয়েকবার আমাকে খবর পাঠান। পরে ভারতের তৎকালীন হাইকমিশনার সাভারে গিয়ে আমাকে অনুরোধ করেন। তিনি আমার জন্য টিকিট ও ভিসা সঙ্গে নিয়ে আসেন। এর কিছুদিন পর বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে বোম্বাই গেলে সেখান থেকে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ ফ্লাইটে আমাকে দেশটির সংসদ ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।’ তিনি বলেন, অনেক আলোচনার পর ভারতের স্বাস্থ্য সেক্টরে উন্নয়নের একটি পলিসি আমি করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটি বাস্তবায়নের আগেই রাজীব গান্ধী মারা যান। পরে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন ঢাকায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

ডা. জাফরুল্লাহর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের গল্পটিও রোমাঞ্চকর। ওই সময় পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতার প্রতিবাদে লন্ডনের হাইডপার্কে যে কয়েকজন বাঙালি তাঁদের পাসপোর্ট ছিঁড়ে আগুন লাগিয়ে রাষ্ট্রবিহীন নাগরিকে পরিণত হয়েছিলেন তাঁদের একজন তিনি। ফলে ভারতীয় ভিসার জন্য তখন ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে তাঁকে ‘রাষ্ট্রবিহীন নাগরিকে’র প্রত্যয়নপত্র জোগাড় করে নিতে হয়।

মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের বিষয়ে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ‘একাত্তরের দিনগুলি’ থেকে জানা যায়, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ও ডা. এম এ মবিনের লন্ডনে এফআরসিএস পরীক্ষার মাত্র এক সপ্তাহ আগে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। তাঁরা পরীক্ষা বাদ দিয়ে ভারতীয় ট্রাভেল পারমিট জোগাড় করে দিল্লিগামী প্লেনে চড়ে বসলেন। “প্লেনটি ছিল সিরিয়ান এয়ারলাইনসের। দামাস্কাসে পাঁচ ঘণ্টা প্লেন লেট, সব যাত্রী নেমেছে। ওরা দুজন আর প্লেন থেকে নামে না। ভাগ্যিস নামেনি। এয়ারপোর্টে পাকিস্তানি এক কর্নেল উপস্থিত ছিল ওই দুজন ‘পলাতক পাকিস্তানি নাগরিককে’ গ্রেপ্তার করার জন্য। প্লেনের মধ্য থেকে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না, কারণ প্লেন হলো ইন্টারন্যাশনাল জোন।” পরে সিরিয়ান এয়ারপোর্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন ওঁদের জন্যই প্লেন পাঁচ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়েছিল।

জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, ‘আগরতলায় জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। তাঁর ব্যাপারে খুব আগ্রহ ছিল।’ স্বাধীনতার পর বেশ কয়েকবার জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে দাওয়াত করে নিয়ে যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। জাফরুল্লাহকে সরাসরি মন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দেন; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বলেন, আপনি দেশ স্বাধীন করতে শাহ আজিজুর রহমান ও শফিউল আযমদের (সচিব) বুদ্ধি লাগেনি। তাহলে দেশ চালাতে এই স্বাধীনতাবিরোধীদের লাগবে কেন? জিয়াউর রহমান তখন দেশের প্রয়োজনে ‘অ্যাকোমোডেটিভ’ (সবাইকে নিয়ে) রাজনীতির কথা বলে যুক্তি দেন। পাশাপাশি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে এ-ও বলেন যে আপনারা সমালোচনা করবেন অথচ দায়িত্ব দিলে সেটি নিতে চাইবেন না।

জিয়ার স্মৃতিচারণা করে জাফরুল্লাহ বলেন, 'আমার মা হাসিনা বেগমকে একবার বেশ ধরেছিলেন জিয়াউর রহমান। তো সব মা-ই চায় ছেলে মন্ত্রী হোক। আমি বিপদে পড়ে গেলাম। পরে আমাকে মন্ত্রী করা হলে কী কী অসুবিধা হবে তার ফিরিস্তি তুলে ধরে উনাকে (জিয়াকে) চার পৃষ্ঠার একটি চিঠি লিখেছি। পরে আরো বহুবার দেখা হয়েছে, সব সময় একই কথা বলতেন, আই গিভ ইউ দ্য ব্লাংক চেক। যেকোনো মন্ত্রণালয় দিতে রাজি আছেন। মন্ত্রী না হতে চাওয়ায় একসময় কিছুটা দূরত্ব হলে পরে তিনি আবার ডেকে পাঠাতেন।'

অবিস্মরণীয় ঘটনা হলো ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ট্র্যাজেডির দুই দিন আগে ১৩ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এবং ১৯৮১ সালের ৩০ মে নিহত হওয়ার দুই দিন আগে ২৮ মে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল জাফরুল্লাহ চৌধুরীর।

১৩ আগস্ট সাভারে লোক পাঠিয়ে বঙ্গবন্ধু ডেকে নেন ডা. জাফরুল্লাহকে। বলেন, 'ডাক্তার, তুমিই ঠিক। সমাজতন্ত্রই আমাদের পথ। আমি তোদের সবাইকে নিয়ে করতে চাই।' কিন্তু জাফরুল্লাহ বলেন, 'বঙ্গবন্ধু, আপনি তো পুঁজিবাদে বিশ্বাস করেন।'

জিয়াউর রহমান

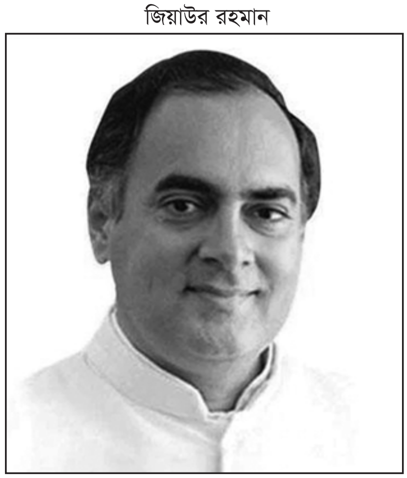

রাজীব গান্ধী

সেদিন কথায় কথায় বঙ্গবন্ধুকে জাফরুল্লাহ জানালেন, তাঁর বিদেশি স্ত্রী বিলাতে অসুস্থ। অথচ তাঁকে বিলাতে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কে যেতে দিচ্ছে না বঙ্গবন্ধু জানতে চাইলে জাফরুল্লাহ বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। তখনকার দিনে বিদেশে যেতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র প্রয়োজন হতো। বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে ওখানে বসেই তাঁর সচিব টি হোসেনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনাপত্তিপত্র আনার ব্যবস্থা করেন। তখন জাফরুল্লাহ আরেক সমস্যার কথা জানিয়ে বললেন, লন্ডনে গেলে টাকার সমস্যা হবে না। কিন্তু বিমানবন্দর থেকে বাসায় যাওয়ার জন্য ১০ পাউন্ড দরকার হবে, যা তাঁর কাছে নেই। এটা কারা দেয় বঙ্গবন্ধু জানতে চাইলে জাফরুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক। এরপর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ব্যাংকে ফোন করে ১০ পাউন্ড জোগাড় করে জাফরুল্লাহর হাতে দেন। বলেন, 'যাও, বউকে দেখাশোনা করে ফিরে এসো।'

১৪ আগস্ট জাফরুল্লাহ চৌধুরী লন্ডনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৫ আগস্ট তিনি হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছানোর আগেই সপরিবারে নিহত হন বঙ্গবন্ধু। সেদিনের পরিস্থিতি বর্ণনা করে জাফরুল্লাহ বলেন, 'বিমানবন্দরে নামতেই দেখি 'মি. চৌধুরী মি. চৌধুরী' বলে মাইকে কে যেন চিৎকার করছে। হাত তুলতেই লন্ডনের গণমাধ্যমের অপেক্ষমাণ সাংবাদিকরা ঘিরে ধরলেন। জানতে চাইলেন, 'মিস্টার চৌধুরী, ইউর প্রাইম মিনিস্টার হ্যাভ বিন কিলড। হোয়াট ইজ ইউর রি-অ্যাকশন!' তিনি জানান, চোখ দিয়ে কখন পানি বের হলো, টের পাইনি। মাত্র এক দিন আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে চার ঘণ্টা গল্প করেছি। বললাম, 'হি পেইড দ্য ন্যাশন উইথ হিজ ওউন ব্লাড (তিনি নিজের রক্ত দিয়ে জাতির ঋণ পরিশোধ করে গেলেন)' এটাই পরদিন লন্ডনের সব পত্রিকায় হেডিং হয়েছিল – জানালেন ডা. জাফরুল্লাহ।

জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডেরও ঠিক এক দিন আগে ১৯৮১ সালের ২৮ মে বঙ্গভবনে তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল ডা. জাফরুল্লাহর। ওই দিন প্ল্যানিং কমিশনের একটি বৈঠকে আন-অফিশিয়াল সদস্য হিসেবে ডা. জাফরুল্লাহকেও ডাকা হয়। জাফরুল্লাহ পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা তুলে সেদিন বলেছিলেন, মানুষ বাড়ছে কি কমছে এ জন্য জন্ম-মৃত্যুর হিসাব থাকা দরকার। জিয়াকে তিনি এ-ও বলেন, তাঁর সরকারের কোনো জবাবদিহি নেই। মাদক, মদ ও সিগারেট নিরুৎসাহ করতে দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করলে জিয়া খেপে গিয়ে বলেন, 'আমি তো সিগারেট খাই না। মদ, সিগারেট খায় আপনার বন্ধু এনায়েতউল্লাহ (প্রয়াত সাংবাদিক এনায়েতউল্লাহ খান)।'

সেদিন বঙ্গবভবন থেকে চলে আসার সময় তৎকালীন এনএসআই প্রধান মেজর জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয় জাফরুল্লাহর। অভিযোগ করে মহব্বতজান বলেছিলেন, চট্টগ্রাম যাওয়ার বিষয়ে তাঁদের নিষেধাজ্ঞা প্রেসিডেন্ট শুনছেন না। 'প্রেসিডেন্টকে বোঝানোর দায়িত্ব আপনাদের' এমন কথা বলে সেদিন বঙ্গভবন ত্যাগ করেছিলেন জাফরুল্লাহ। পরদিন ২৯ মে বিমানের একটি ফ্লাইটে চট্টগ্রামে যান জিয়াউর রহমান। ৩০ মে এক দল সেনা সদস্যের হাতে তিনি নিহত হন।

বঙ্গবন্ধু ও জিয়াউর রহমান দুটি হত্যাকাণ্ডেরই এক দিন আগে তাঁর সঙ্গে এই দেখা হওয়ার ঘটনাকে নিজের জন্য 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে মনে করেন ডা. জাফরুল্লাহ। তিনি বলেন, 'একইভাবে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের কিছুদিন পর রাজীব গান্ধীও বোমা বিস্ফোরণে নিহত হলেন!'

▲গণস্বাস্থ্য

সৌজন্যে : কালের কণ্ঠ, ১৯ জুলাই ২০২১

ইসলামের ক্রমবিকাশে নারী চিকিৎসক

শান্তা আনোয়ার

ইসলামের ক্রমবিকাশের সময় যখন নারীরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে, পশ্চিমের নারীরা তখন ঘরের কোণে বসে থাকতেন। মহানবীর সময় থেকেই মুসলিম বিশ্বের নারীরা ব্যাপকভাবে চিকিৎসা পেশায় যুক্ত ছিলেন।

এমনকি রাসুল (সা.)-এর যুগেও ৯ জন নারী চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁরা শল্যচিকিৎসা এবং ধাত্রীবিদ্যা সহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।

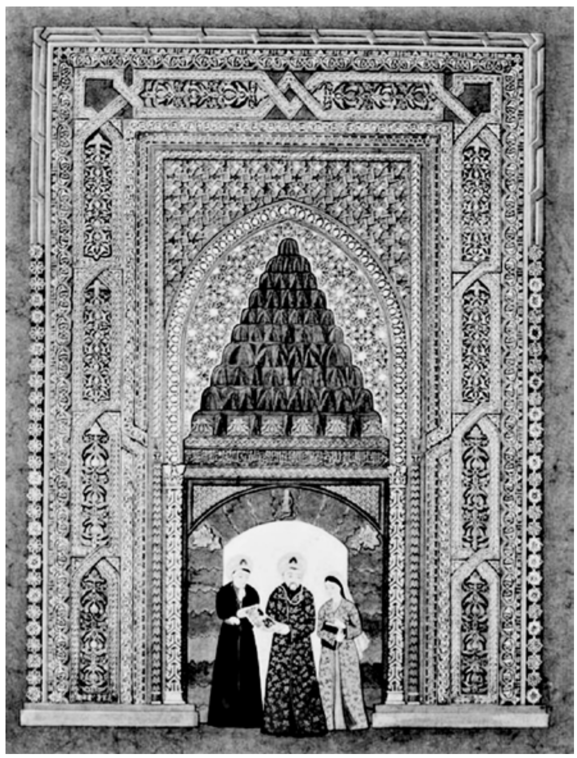

দার উস শিফার প্রধান ফটকে প্রধান চিকিৎসক শরফুদ্দিনের সাথে দু'জন মহিলা চিকিৎসক।

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় চিকিৎসা বিদ্যায় নারীদের অংশ নেয়া শুরুই হয় মুসলমানদের হাতে।

ইসলাম আবির্ভাবের প্রথমদিকেও মুসলিম নারীরা চিকিৎসাশাস্ত্রের চর্চা করেছেন এমন অনেক প্রমাণ রয়েছে। আন্দালুসের আল-জাহারাভি মিডওয়াইফদের উপরে নির্ভর করতেন যারা প্রসূতি ও নারী স্বাস্থ্যের চিকিৎসার সময় আল জাহারাভিকে সাহায্য করতেন। শেহাবুলদিন আল-সাইগের-এর মেয়ে সেই সময়ে মিশরের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল, আল মনসৌরি হাসপাতালে সিনিয়র চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতেন।

নারী চিকিৎসকরা হাসপাতালে কাজ করার পাশাপাশি তারা তাদের বাড়িতে রোগীদের দেখতে যেতেন। আল-তাব্বারী তার 'তারীখ আল রসুলওয়া আল মুলুক' বইয়ে বলেছেন যে আবু আল-হাসান নামে একজন পুরুষ চিকিৎসকের কাছে একজন মহিলা রোগী তার কাঁধে সংক্রমিত ক্ষত নিয়ে তাকে দেখাতে এসেছিলেন এবং তিনি তাকে বলেছিলেন : 'আমি একজন একজন চক্ষু চিকিৎসক কিন্তু আমাদের এখানে একজন নারী চিকিৎসক আছেন, যিনি আপনার চিকিৎসা করবেন।'

ইবনে আল-হাজ্জ তার বই 'আল-মাদখাল'-এ বর্ণনা করেছেন যখন তিনি ১৩ ও ১৪ শতাব্দীর সময় কায়রোতে, তখন মুসলিম নারীরা কীভাবে পরিবারগুলিতে মিডওয়াইফদের সেবা দিতো এবং মহিলাদের প্রসব করার ব্যবস্থা করেছিল এবং তাদের নবজাতক শিশুদের চিকিৎসা দিতেন।

মুসলিম নারীরা ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম থেকেই বিভিন্ন যুদ্ধে আহতদের সাহায্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে সেবা কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সেই সময়ে নারী চিকিৎকদের কাজ ছিলো মূলত যুদ্ধাহত রোগীদের দেখাশোনা করা, ছোট অস্ত্রোপচারের পাশাপাশি জটিল ট্রমা সার্জারি করা।

নারী চিকিৎসকেরা 'হিজামা' চিকিৎসাও জানতেন। 'হিজামা' আরবি শব্দ। এর বাংলা অর্থ হল শিঙ্গা লাগানো। তখনকার সময় প্রচলিত চিকিৎসার আরবি নামকরণ হচ্ছে হিজামা। মাথাব্যথা, শরীরব্যথার মত অসুস্থতা নিরাময়ে এই চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয়।

নারী চিকিৎসকরা ক্ষতের পরিচর্যা করতেন, রক্তপাত বন্ধ করতেন, ড্রেসিং পরিবর্তন করতেন এবং হাতের তৈরি ক্রিম দিয়ে ক্ষত নিরাময় করতেন।

নারীরা ওষুধ তৈরিতেও ভূমিকা রাখতেন। 'আল-তাব্বারী' বইয়ে বলা হয়েছিল যে নারীরা সঠিক এন্টিসেপটিক ক্রিম তৈরি করে সংক্রামিত ক্ষত নিরাময়ে সহায়তা করতেন।

বানী ওউদের জয়নব চোখের রোগে চিকিৎসায় এবং ওষুধ তৈরিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আল শিফা বিনতে আবদুল্লাহ, যিনি হাতে তৈরি উপরি প্রয়োগের (Topical) ক্রিম দিয়ে ত্বকের ক্ষতের চিকিৎসা করতেন। তাকেও হুসবাহ বা ওষুধের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার প্রধান হিসেবে দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব নিযুক্ত করেছিলেন।

রাসুল (সা.)-এর যুগে যে ৯ জন নারী চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রুফায়দা আল আসলামিয়াহ।

হিজরতের পর মদীনায় মহানবীর কাছে রুফায়দা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কয়েকটি যুদ্ধে নবী (সাঃ)-এর সাথে চিকিৎসক হিসেবে যোগ দেন। তিনি বদর যুদ্ধেও আহত যোদ্ধাদের সুস্থ হতে সহায়তা করেছিলেন।

মুসলিম নারীরা ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম থেকেই বিভিন্ন যুদ্ধে আহত যোদ্ধাদের সাহায্য করতেন এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। এই ছবিটাতে সেটা তুলে ধরা হয়েছে।

রুফায়দা তার চিকিৎসার অধিকাংশ জ্ঞান তার পিতা সাদ আল-আসলামির কাছে থেকে শিখেছিলেন। এছাড়াও আল-খান্দাকের যুদ্ধে তিনি একটি মেডিকেল টেন্ট (যা আধুনিক যুগে ব্যবহৃত সামরিক মোবাইল হাসপাতালের মতো) নিয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যাতায়াতের সময় আঘাতের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত থাকতেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই প্রথম সামরিক মোবাইল ফিল্ড মেডিকেল সেন্টারের দায়িত্বে ছিলেন। মুসলিম চিকিৎসকেরাও রণাঙ্গনে প্রথম মেডিকেল টেন্ট ব্যবহার করেন।

তিনি খাইবার যুদ্ধের আগে কিছু নারী সঙ্গীকে প্রাথমিক চিকিৎসা ও নার্সিং সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। এই নারী নার্সরা তাকে তার ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল সামরিক তাঁবু চালাতে এবং আহতদের দেখাশোনার জন্য দিনরাত সাহায্য করতেন।

যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা স্বীকৃতি দিয়ে যুদ্ধের সময় যেকোনো যোদ্ধার মতোই যুদ্ধের গনীমতের ঘানায়েম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুফায়দাকে দান করেছিলেন। রুফায়দার দুর্দান্ত ক্লিনিকাল দক্ষতার সাথে ছিলো নেতৃত্বের গুণাবলি। তিনি শুধু চিকিৎসা সেবা দেয়াই নয় – অন্যান্য মেয়েদেরও নার্স হতে এবং স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও প্রশিক্ষিত করেছিলেন।

▲গণস্বাস্থ্য

তথ্যসূত্র :

Muslim Female Physicians and Healthcare Providers in Islamic History; Sharif Kaf Al-Ghazal, Marium Husain; JBIMA; Vol 7, No. 3, April 2021, pp 23-30

[লেখিকার অনুমতিসহ তাঁর ব্লগ থেকে]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত
বাংলাদেশে প্রথম ওরাল স্যালাইন প্রস্তুতকারী ওষুধ কোম্পানী
গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ তালিকা এর অন্তর্ভুক্ত

নতুন ফর্মূলায়
জি-ও আর এস (G-ORS)
সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে
মূসকসহ সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৳ : ৫.০০ প্রতি স্যাচেট

দেশের স্বাস্থ্যের জন্যে

গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ লিমিটেড
মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টঃ, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪, বাংলাদেশ

তুরস্কের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের গড়ে তোলা এক অনন্য লাইব্রেরি

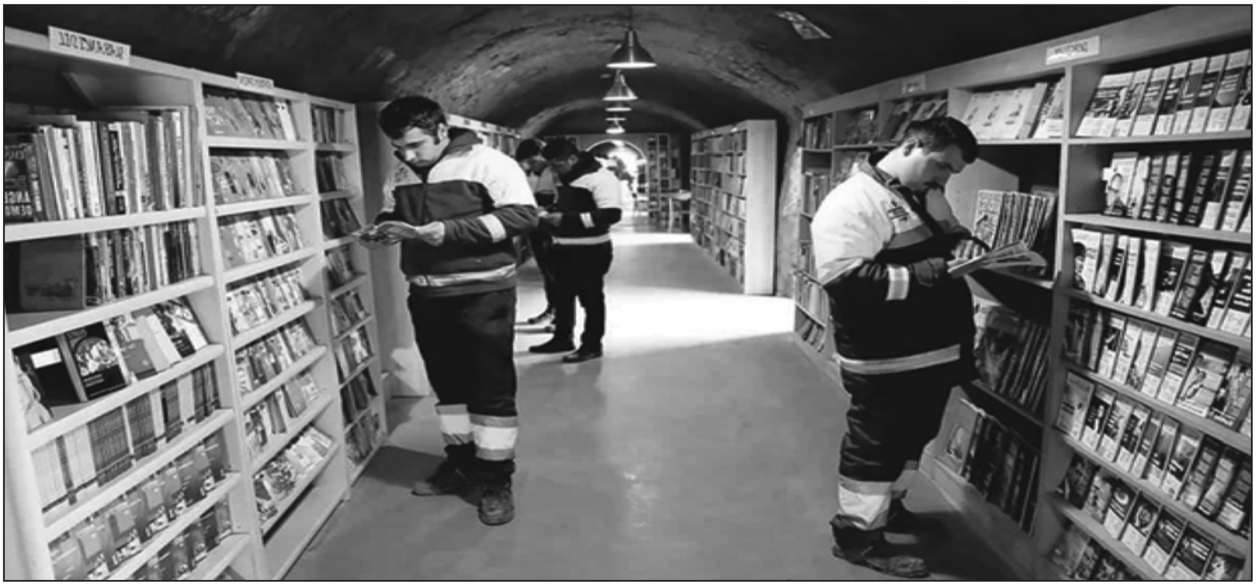

কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'যেখানে পাইবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই/পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন'। তুরস্কের পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা ছাই না-ঘাটলেও, ময়লার ভাগাড় থেকে উদ্ধার করা বই নিয়ে গড়ে তুলেছেন আস্ত একটা লাইব্রেরি – যা বহু মূল্যবান বইপত্রে ঠাসা। অথচ এসব বই এর সাবেক মালিকরা ময়লার স্তূপে ফেলে দিয়েছিলেন।

ঘটনাটা তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারার চানকায়া (Cankaya) নামক জেলার। সেখানে দুরশন (Durshan) নামে একজন স্যানিটেশন কর্মী একদিন কাজ করার সময় এক-ব্যাগ ভর্তি বই কুড়িয়ে পান। সেই সূত্রে তিনি সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করলে সকলেই বই সংগ্রহ করার ব্যাপারে একমত হন। সেই শুরু।

এইভাবে ২০০ বই সংগৃহীত হবার পর নিজেদের ভেতরেই বইয়ের আদান প্রদান করে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে চলতে থাকে ফেলে দেয়া বই সংগ্রহের কাজ। ঘটনা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ার পর নাগরিকরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদেরকে বই দেয়া শুরু করেন। এভাবে সংগ্রহ করা বই কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গেলে তাদের মধ্যে একটা লাইব্রেরি করার ভাবনা উঁকি মারতে শুরু করে। চানকায়ার মেয়র Alper Tasdelen-এর সহযোগিতায় একটি পরিত্যক্ত ইটাখোলায় গড়ে তোলা হয় লাইব্রেরি। ফিকশন ও নন-ফিকশন মিলিয়ে ৬,০০০-এর ওপর বই আছে সেখানে। শিশুদের জন্য আলাদা একটা বিভাগও আছে। প্রথমে স্যানিটেশন কর্মী এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীরাই কেবল এখান থেকে বই নিয়ে পড়তে পারেতন। বর্তমানে সর্বসাধারণের জন্য বই পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংগৃহীত বই প্রথমে ব্যবহারযোগ্য কিনা সেটা যাচাই করা হয়। যদি পাঠ ও ব্যবহারযোগ্য থাকে তবেই সেগুলি লাইবেরিতে রাখার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হয়। এখানে আছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিপুল সংগ্রহ, শিশুদের জন্য একটি সমৃদ্ধ বিভাগ – এমনকি ইংরেজি ও ফ্রেন্স ভাষার বইও শোভা পাচ্ছে। লাইব্রেরির দেয়ালের সৌন্দর্যবধনের জন্য চিত্রকর্মও ঝোলানো হয়েছে।

পাঠকরা এখান থেকে দুই সপ্তাহের জন্য বই পড়ার জন্য নিতে পারেন এবং প্রয়োজনে এই সময় এক সপ্তাহ বাড়িয়ে নেয়া যায়। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ স্কুল ও শিক্ষা কার্যক্রম বই ভাড়া নেয়। এমনকি কোন কোন কারাগার কর্তৃপক্ষও এখান থেকে বই নিয়ে যান ।

গ্রামের স্কুলের শিক্ষকরাও এখান থেকে বই নেবার আগ্রহ প্রকাশ করছেন। লাইব্রেরিটা বর্তমানে এতই কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, এর দেখাশোনার জন্য পূর্ণ সময়ের কর্মী রাখতে হয়েছে। আপনি চাইলে সেখানে বসে চা পান করতে করতে বই পড়তে পারবেন। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের একজন দুঃখ করে বলেন, এই কাজটা আগে শুরু করা গেল আরো কয়েক হাজার বকই লাইব্রেরিতে শোভা বর্ধন করত।

▲গণস্বাস্থ্য

https://www.goodnet.org/articles/turkish-garbage-collectors-open-library-from-books-rescued-trash

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চক্র

সুজয় কুমার দাস
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগে দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত

গত বছরের শুরুতে চীনের উহাং প্রদেশে প্রথম আবির্ভাব ঘটে করোনা ভাইরাসের। ওয়ার্ল্ডমিটার-এর তথ্য অনুযায়ী সেই থেকে এ যাবৎ (৩১ অক্টোবর ২০২১) পুরো বিশ্বে পঞ্চাশটিরও বেশি দেশে ২৪৭,৪৪৬,৫০৩ জন মানুষ এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয় এবং এর মধ্যে ৫,০১৪,৭৪৮ জন মানুষ প্রাণ হারান। করোনা ভাইরাসের এত দ্রুত সংক্রমিত হবার পেছনে একটা অন্যতম কারণ হলো এটি একটি আরএনএ (RNA) ভাইরাস। আরএনএ প্রতিলিপন প্রক্রিয়ায় প্রুফ রিডিং-এর ব্যবস্থা নেই। তবে ডিএনএ প্রতিলিপন প্রক্রিয়ায় প্রুফ রিডিং ব্যবস্থা আছে। বলে রাখা ভালো, প্রতিলিপন প্রক্রিয়ায় কোন ভুল হয়েছে কিনা সেটা নির্ণয় করা হয় প্রুফ রিডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আরএনএ প্রতিলিপনে প্রুফ রিডিং-এর ব্যবস্থা না থাকায় সেখানে ভুল হবার সম্ভাবনা বেশি। এই কারণে আরএনএ ভাইরাসে পরিবৃত্তি বা মিউটেশান ঘটার সম্ভাবনাও বেশি। **তাছাড়া কোন ভাইরাসের অধিক পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ার দরুনও ঐ ভাইরাসের পরিবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। পরিবৃত্তির মাধ্যমে তৈরি হওয়া নতুন ভ্যারিয়েন্ট পূর্বের ভ্যারিয়েন্ট -এর তুলনায় অনেক বেশি সংক্রামক এবং মারাত্মক হতে পারে।** সারস-কোভিড-২ (SARS-CoV-2) ভাইরাসে এ পর্যন্ত অনেকবার পরিবৃত্তি ঘটেছে। ফলে কয়েকটা নতুন ভ্যারিয়েন্ট সৃষ্টি হয়েছে যেগুলি আগের ভ্যারিয়েন্ট-এর তুলনায় অনেক বেশি সংক্রামক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চারটি ভ্যারিয়েন্টকে ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন-এ তালিকাভুক্ত করেছে : আলফা, বেটা, ডেলটা, গামা। আলফা ভ্যারিয়েন্ট প্রথম শনাক্ত হয় যুক্তরাজ্যে। এই ভ্যারিয়েন্টে সংক্রমণের হার পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে যায় এবং মৃত্যুর হারও বেড়ে যায়। বেটা ভ্যারিয়েন্ট প্রথম শনাক্ত হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। এই ক্ষেত্রেও সংক্রমণের হার পঞ্চাশ ভাগ বাড়ে। ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট প্রথম শনাক্ত হয় আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারতে। এই ভ্যারিয়েন্ট ভারতে কী রকম তুলকালাম কাণ্ড চালায় তা আমরা সবাই জানি। নতুন ভ্যারিয়েন্টগুলোতে সংক্রমণের হার বেড়ে যাওয়ার কারণ বোঝতে হলে করোনা ভাইরাস কীভাবে আমাদের কোষে আক্রমণ করে সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা আছে। শুধু তা-ই নয় – করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে সফল ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও এর জীবন চক্র বোঝার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিজ্ঞানীরা শুরু থেকেই করোনা ভাইরাসের জীবন চক্র বোঝার চেষ্টা করে আসছিলেন। এই লেখাটা সারস-কোভিড-২ এর জীবন চক্র নিয়ে।

প্রস্তুতি পর্যায়

ভাইরাস জীব এবং জড়ের মাঝামাঝি একটা সত্তা। এর জীবিত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় কোন পোষক (Host) কোষের সংস্পর্শে এলে। সারস-কোভিড-২ এর বাইরের পৃষ্ঠে এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত ২৪-৪০টি স্পাইক প্রোটিন রয়েছে। মানব কোষকে আক্রমণের জন্যে স্পাইক প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যান্য ভাইরাসের তুলনায় করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন অনেক বেশি নমনীয়। নমনীয়তার আধিক্য এদেরকে পোষক কোষের তল খুঁজে পেতে এবং সেখানে একসাথে অনেকগুলো স্পাইক প্রোটিন এর যুক্ত হবার সম্ভাবনা বাড়ায়। স্পাইক প্রোটিনে থাকা রিসেপ্টর বাইন্ডিং ডোমেইন (RBD: Receptor binding domain) আমাদের কোষে থাকা ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2) বাইন্ডিং সাইটে যুক্ত হয়। সারস কোভিড ভাইরাসও পোষক কোষে যুক্ত হবার সময় একই বাইন্ডিং সাইট ব্যবহার করে। তবে এর তুলনায় সারস-কোভিড-২ দুই থেকে চার গুণ বেশি শক্তভাবে ACE2 বাইন্ডিং সাইটে যুক্ত হতে পারে। ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন-এ থাকা ভ্যারিয়েন্টগুলোর RBD সিকোয়েন্সে পরিবর্তন সাধিত হবার কারণে সেগুলোর বাইন্ডিং সাইটে যুক্ত হবার ধরন পাল্টে যায়। উদাহরণস্বরূপ আলফা ভ্যারিয়েন্টের স্পাইক প্রোটিন সিকোয়েন্সে দশটি পরিবর্তন সাধিত হবার দরুন এর RBD আরও খাঁড়াভাবে ACE2 বাইন্ডিং সাইটে যুক্ত হতে পারে। ফলে আরও সহজে এটি পোষক কোষে প্রবেশ করতে পারে। পুরো বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের RBD সাইটে তিনটি মিউটেশান ঘটার কারণে এর পোষক কোষে প্রবেশ করার প্রক্রিয়া আরও সহজ এবং দ্রুত হয়ে গেছে।

পোষক কোষে প্রবেশ

পোষক কোষের বাইন্ডিং সাইটে যুক্ত হবার পরে, সেখানকার কিছু প্রোটিন এর সাহায্যে ভাইরাল কোষ ঝিল্লীটি পোষক কোষের কোষ ঝিল্লীর সাথে মিশে যায়। পোষক কোষ পর্দায় থাকা টেম্প্রেস ২ (TMPRSS2) নামক প্রোটিয়েজ এনজাইম সারস-কোভিড-২ এর

করোনা ভাইরাসের জীবনচক্র

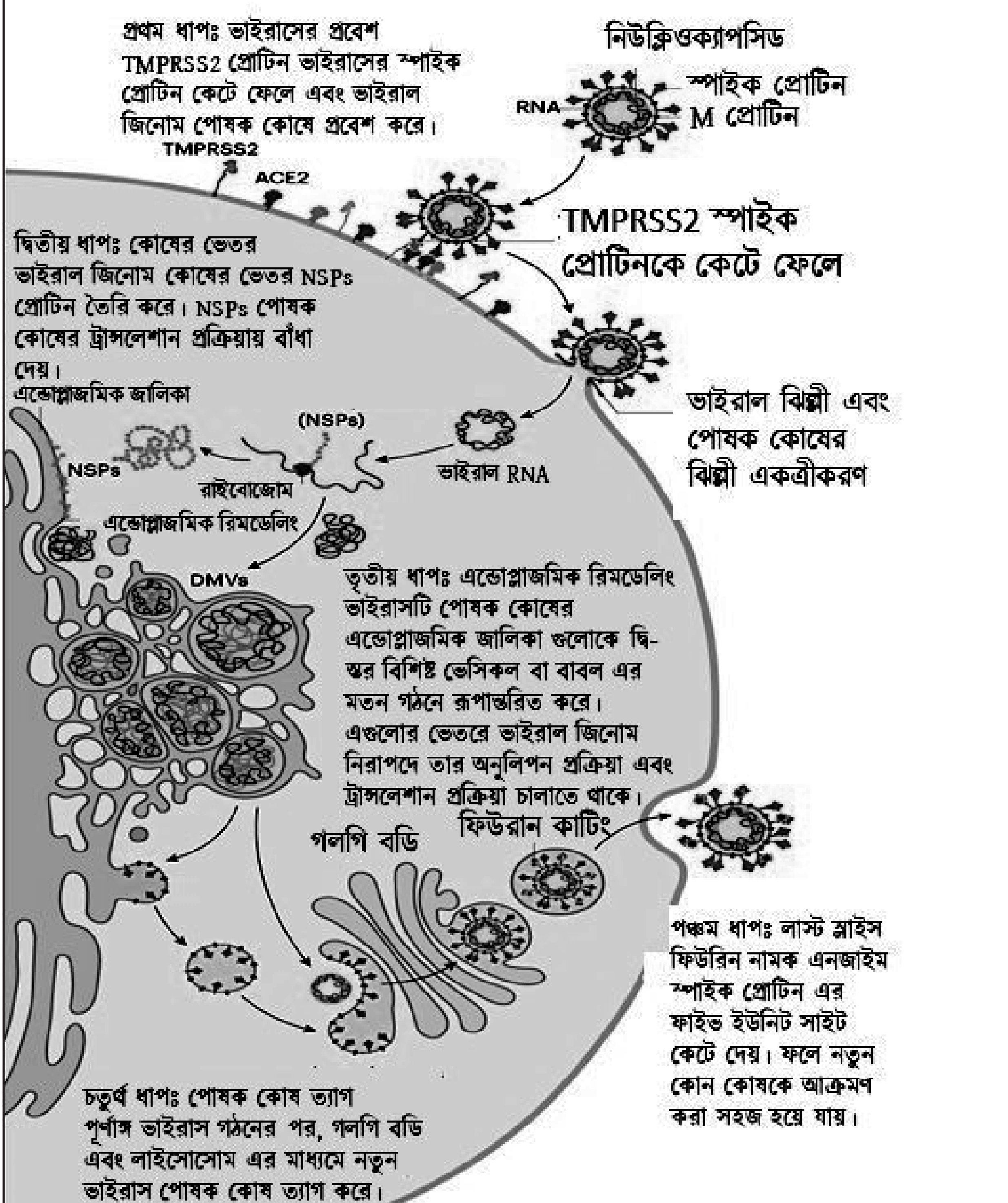

স্পাইক প্রোটিন এর S2 সাবইউনিটে কেটে এর ভেতরের নিউক্লিয় বস্তুকে পোষক কোষের ভেতরে প্রবেশে সহায়তা করে। TMPRSS2 শ্বসন অঙ্গের কোষে প্রচুর পরিমাণে থাকে। তবে অন্যান্য সারস-কোভিড ভাইরাস এন্ডোসোমে থাকা ক্যাথেপসিন এল (cathepsin L) নামক প্রোটিয়েজ এনজাইম এই ব্যবহার করে। TMPRSS2, cathepsin L এর তুলনায় দ্রুত কাজ করে এবং অ্যান্টিভাইরাল প্রোটিন ভাইরাসকে শনাক্ত করতে পারে না। কিন্তু এন্ডোসোমের মাধ্যমে ভাইরাসের প্রবেশের সময় অ্যান্টিভাইরাল প্রোটিন ভাইরাস শনাক্ত এবং আক্রমণ করতে পারে। এই কারণে কোন অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ (যেমন ক্লোরোকুইন) সারস-কোভিড-২ ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে পারে না এবং এটি অন্যান্য সারস ভাইরাসের তুলনায় দ্রুত পোষক কোষে প্রবেশ করতে পারে।

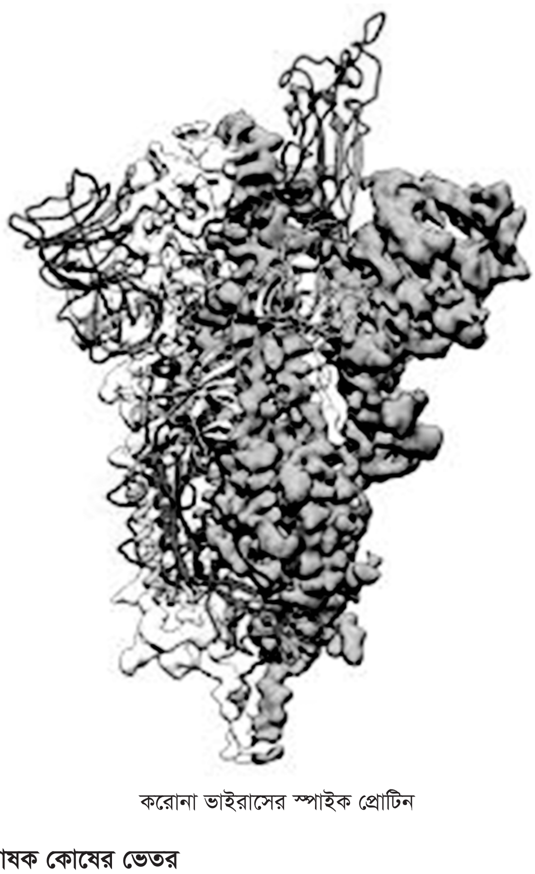

করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন

পোষক কোষের ভেতর

পোষক কোষের ভেতরে ভাইরাল RNA জিনোম প্রবেশের পর, ভাইরাল জিনোম পোষক কোষের রাইবোজোম কে ব্যবহার করে নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন (NSP: Non structural protein) তৈরি করে। NSP পোষক কোষের ট্রান্সলেশান (প্রোটিন তৈরি প্রক্রিয়া) প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। শুধু তা-ই নয়, NSP প্রোটিনগুলো পোষক কোষের mRNA-কে নিউক্লিয়াস থেকে বের হওয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। (mRNA এর কাজ হচ্ছে কোষের নিউক্লিয়াস থেকে প্রোটিন তৈরি জিনোমিক তথ্য কপি করে রাইবোজোম এ নিয়ে যাওয়া। রাইবজোম mRNA জিনোম সিকোয়েন্স থেকে প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি করে)। ফলে কোষ তার প্রয়োজন মত ইন্টারফেরন প্রোটিন (ভাইরাসের সংক্রমণ এর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা তৈরি করতে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সংকেত প্রদান করে ইন্টারফেরন প্রোটিন) উৎপাদনে ব্যর্থ হয়।

পোষক কোষের রিমডেলিং

এই ধাপে ভাইরাসটি পোষক কোষের এন্ডোপ্লাজমিক জালিকাগুলোকে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট ভেসিকল (DMVs: Double membrane vesicles) বা বাবল এর মতন গঠনে রূপান্তরিত করে। এগুলোর ভেতরে ভাইরাল জিনোম নিরাপদে তার অনুলিপন প্রক্রিয়া এবং ট্রান্সলেশান প্রক্রিয়া চালাতে থাকে। ভাইরাল RNA প্রথমে ১৬টি প্রোটিন তৈরি করে যেগুলো ভাইরাল RNA এর সংখ্যা বাড়াতে থাকে। অধিক পরিমাণ RNA ভাইরাসের বিভিন্ন অংশ যেমন স্পাইক, ঝিল্লী তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় ২৬টি প্রোটিন উৎপাদন করতে থাকে। ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস গঠনের জন্যে সবগুলো অংশ গঠিত হয়।

পোষক কোষ ত্যাগ করা

তৈরি হওয়া অংশগুলো একত্রিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস গঠনের পরে সেগুলো পোষক কোষের গলগি বডি অথবা লাইসোসোম-কে ব্যবহার করে কোষ থেকে বের হয়ে যায়। অন্যান্য সারস ভাইরাস কোষ ঝিল্লী দিয়ে পোষক কোষ ত্যাগ করে। পোষক কোষ ত্যাগ করার রাস্তা হিসেবে গলগি বডি কিংবা লাইসোসোম তুলনামূলক ভাবে ধীর গতির প্রক্রিয়া। সারস-কোভিড-২ কেন গলগি বডি কিংবা লাইসোসোমকে এই ক্ষেত্রে বেছে নেয় তার কারণ এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার নয়। হয়ত গলগি বডি কিংবা লাইসোসোম এর পর্দায় থাকা লিপিড অণুগুলো সারস-কোভিড-২ কে অন্য কোন সুবিধা দেয়।

দ্যা লাস্ট স্লাইস

সারস-কোভিড-২ ভাইরাসের S1 সাবইউনিটে পাঁচটা অ্যামাইনো এসিড (Amino Acid)-এর একটা সাইট থাকে। অ্যামাইনো এসিড-এর সিকোয়েন্সটা এ রকম : প্রোলিন, আর্জিনিন, আর্জিনিন, অ্যালানিন এবং আর্জিনিন। পোষক কোষ ত্যাগ করার সময় পোষক কোষে থাকা ফিউরিন নামক এনজাইম এই ফাইভ ইউনিট সাইট কেটে দেয়। ফলে ভাইরাসের পক্ষে নতুন কোন কোষ বিশেষ করে ফুসফুসের কোষকে আক্রমণ করা সহজ হয়ে যায়। এভাবে সারস-কোভিড-২ একটার পর একটা কোষকে আক্রমণ করতে থাকে।

▲গণস্বাস্থ্য

তথ্যসূত্র :
How the coronavirus infects cells.

প্রথম প্রকাশ : *বিজ্ঞান ব্লগ*, সেপ্টেম্বর ২০২১

ভেন্টিলেটর কাহিনি – একজন নার্সের লেখা থেকে

ভেন্টিলেটর জিনিসটা কী? যারা শুধু নাম শুনেছেন কিন্তু আদৌ বুঝতে পারছেন না, কিন্তু খুব অবহেলায় সময় পার করছেন তারা দয়া করে লেখাটি পড়ুন।

এটা কোনো অক্সিজেন মাস্ক না যে ডাক্তার অথবা নার্স এসে আপনার মুখে লাগিয়ে দিলো আর আপনি বেডে শুয়ে আয়েশ করে পত্রিকা পড়লেন। ইচ্ছে হলে খুলে রেখে জুস পান করলেন বা কারো সাথে গল্প করলেন।

কোভিড-১৯ এর ভেন্টিলেশন (Ventilation) খুবই বেদনাদায়ক একটা প্রক্রিয়া। এটা আপনার কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়ে প্রবেশ করানো হয় এবং মারা যাওয়া অথবা পুনর্জীবন লাভ করার আগ পর্যন্ত সেখানেই থাকে। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় ২-৩ সপ্তাহ শরীরে কোনো নড়াচড়া নেই, মাথা থাকে নীচের দিকে, গলা থেকে শ্বাসনালী পর্যন্ত একটা টিউব সংযুক্ত থাকে এবং লান্‌জ মেশিনের মাধ্যমে শুধু শ্বাস নেয়া ছাড়া রোগীর জীবনে অন্য কোনো কিছু করার থাকে না। প্রবল যন্ত্রণা থেকে রোগীকে মুক্ত রাখার জন্য রোগীকে বলতে গেলে একেবারে কোমাতেই রেখে দেয়া হয়।

নাকের মধ্য টিউব দিয়ে অথবা স্কিনের ভিতর দিয়ে লিকুইড খাবার দেয়া হয়। পশ্চাতদেশের সাথে একটা স্টিকি ব্যাগ বেঁধে রাখা হয় – ইউরিন, স্টুল নেয়ার জন্য। বিপি চেক করার জন্য মনিটরের সাথে আরেকটা লাইন লাগানো হয়। এগুলো ছাড়া শরীরকে সচল রাখতে প্রতি দু'ঘন্টায় CRNA's and MA's করা হয়। কারো সাথে কথা বলা দূরের কথা। না থাকে কোনো খাওয়া-দাওয়া, না শরীরকে এপাশ ওপাশ করা। শরীরে প্রাণ যাওয়া আসার মাঝে শুধু থাকে দম। একটা মেশিন শুধু জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখে।

এ অবস্থায় যদি কারো বিশ দিন যায় – তিনি যতই প্রাণশক্তির অধিকারী তরুণ, বলবান হোন না কেন ৪০% জীবনীশক্তি তার নিঃশেষ হয়ে যায়। মানসিক অবসাদ দেখা দেয়। দেখা দেয় শারীরিক অন্যান্য জটিলতা। বিশেষ করে হার্ট কপ্লিকেশন।

ফলে যারা একটু বয়স্ক, দুর্বল তাদের বেশিরভাগই ভ্যান্টিলেটরে একবার চলে গেলে আর ফিরে আসেন না। এটা কোনো ফ্লু ভাইরাস নয়। এটা একটা মৃত্যু ভাইরাস।

কেউ কি এসবের ভিতর দিয়ে যেতে চান? করোনা চলে গিয়েছে কিংবা দুর্বল হয়ে গিয়েছেন এমন ভাবলে ভয়াবহ রকমের ভুল করবেন।

তাই দয়া করে সতর্ক থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদ থাকুন। সব রকমের ভিড় থেকে নিজেকে এবং প্রিয়জনকে দূরে রাখুন।

▲গণস্বাস্থ্য

সৌজন্যে : আরিফ মাহমুদ

শিশু, গর্ভবতী, বয়স্ক ও অসুস্থদের প্রতিদিন

মিনাভিট খাওয়ান

কম খরচে-অধিক পুষ্টি

মিনাভিটে

রয়েছে শরীরের জন্য
অতীব প্রয়োজনীয়
২৫ টি ভিটামিন
আমিষ ও খনিজ পদার্থ।

দেশের স্বাস্থ্যের জন্যে

গণস্বাস্থ্য ফুডস্ লিমিটেড

ঢাকা কার্যালয় : ১৬০, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
কারখানা : বিসিক শিল্পনগরী, কক্সবাজার-৪৭০০, বাংলাদেশ

(জেলা/উপজেলা ভিত্তিক পরিবেশক নিয়োগ দেয়া হবে। মোবাইল : ০১৮১০০৬১৩৭৩)

ধারাবাহিক

মশা থেকে সৃষ্ট ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু এবং অন্যান্য অসুস্থতা

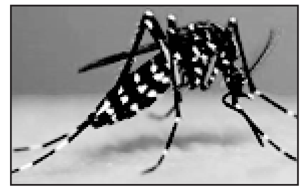

[স্পানিস ভাষায় মশাকে ছোট পোকা বা স্মল ফ্লাই (Small fly) বলে। ডাইনোসর যুগের সময় থেকেই মশার উপস্থিতির কথা জানা যায়। অর্থাৎ ৪০০ মিলিয়ন বছর আগেও মশা ছিল। তবে সে সময়ে মশা ছিল বর্তমান সময়ের মশার তুলনায় তিনগুণ বড়। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস আফ্রিকা থেকেই মশার উদ্ভব এবং সেখান থেকেই ক্রমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।
মশার সাথে ম্যালেরিয়ার সম্পর্কের কথা সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস (Roland Ross)। ১৮৯৭ সালের ২০ আগস্ট বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস ভারতের সেকেন্দ্রাবাদে এই যুগান্তকরী আবিষ্কারেরর কথা জানান দেন। তবে মশা কেবল ম্যালেরিয়া নয়; আরও বহু রোগের কারণ। যার ভেতরে আছে পীত জ্বর (Yellow fever), চিকুনগুনিয়া (Chikungunia), ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস (West Nile virus), এনসেফালাইটস (Encephalitis) প্রভৃতি। বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন দেশে মশার কারণে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে যে রোগ; সেটি হলো ডেঙ্গু (Dengue)। বাংলাদেশে জুলাই থেকে ডিসেম্বর অবধি ডেঙ্গু রোগের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায় ফি-বছর। মূলত জনসচেতনতার অভাবে প্রতি বছর আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হবার পাশাপাশি ব্যাপক প্রাণহানিও ঘটে। অথচ খানিকটা সচেতন হলে এসব মৃত্যু এড়ানো যায়। এই প্রেক্ষাপটে আমরা এই সংখ্যা থেকে প্রকাশ করছি মশা-সৃষ্ট রোগের ওপর এই ধারাবাহিকটি। এটি প্রকাশের সদয় অনুমতি দিয়েছেন Hesperian Health Guides-এর Tawnia Litwin. এজন্য তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করি এর মাধ্যমে পাঠকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগ থেকে সুরক্ষা পাবেন।]

মশা নানা ধরনের অসুস্থতা বহন করে এবং সেগুলো তাদের কামড়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। জলবায়ুর পরিবর্তন আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্রতর করে তুলছে, যে অবস্থাগুলো মশা বিস্তারের জন্য অনুকূল। অনেক ভিন্ন ধরনের মশা আছে। কোন কোন মশা ডোবার জলে বংশবিস্তার করে, অন্যান্যগুলো বৃষ্টিতে বা সংরক্ষিত পানীয় জলে। কোন কোন মশা রাতে কামড়ায়, অন্যগুলো দিনের বেলায়। কোন কোনটি শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে অসুস্থতা ছড়ায় এবং অন্যগুলো প্রাণীদেরকেও অসুস্থ করে তুলতে পারে।

কামড় দেবার মাধ্যমে মশা অসুস্থতা ছড়ায়

মশা থেকে ভাইরাস। মশার কামড়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়ানো অনেক অসুস্থতাই ভাইরাসের কারণে সৃষ্টি হয়। বেশিরভাগ ভাইরাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তিটি একবার ভাল হয়ে উঠলে সে রোগ প্রতিরোধক হয়ে উঠবে এবং একই ভাইরাস আর তাকে আক্রান্ত করবে না। কিন্তু কোন কোন ভাইরাস যেমন ডেঙ্গুর সামান্য আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বেশ কয়েকটি সংস্করণ আছে (সেরোটাইপ বলা হয়)। ফলে একজন ব্যক্তি একাধিক বার ডেঙ্গু আক্রান্ত হতে পারে। দ্বিতীয়বার ডেঙ্গু হলে অসুস্থতাটি আরও বেশি সঙ্কটজনক হয়ে উঠতে পারে। একটি এলাকার অনেক ব্যক্তিই একবার ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা প্রত্যেকেই প্রতিরোধক হয়ে উঠবে। তখন অল্প সংখ্যক ব্যক্তি অসুস্থ হবে এবং মনে হতে পারে যে অসুস্থতাটি চলে গেছে। কিন্তু এলাকাতে শিশুর জন্ম হলে এবং যাদের কখনওই এই অসুস্থতাটি হয়নি এলাকায় তাদের আগমন হলে ভাইরাসটি আবারও ক্ষতি করতে পারে। তাই হয়তো কোন কোন বছরে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেবে, আবার কোন কোন বছর খব কম রোগ দেখা দেবে। এই একই কারণে যে অঞ্চলের কারোরই সংক্রমণ হয়নি এমন একটি অঞ্চলে একটি নতুন ভাইরাসের আগমন হলে অনেক ব্যক্তিই সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ হয়।

মশা থেকে পরজীবী। একটি খুবই ছোট পরজীবী থেকে ম্যালেরিয়া হয় – যা আমাদের রক্ত কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তার মধ্যে বেঁচে থাকে। এই পরজীবী আমাদের রক্তের মধ্যে একটি আক্রান্ত মশার কামড়ের মাধ্যমে প্রবেশ করে। মশা ম্যালেরিয়ার এই পরজীবী একজন ব্যক্তির শরীরের মধ্যে প্রবেশ করানোর পর অনেক বছর ধরে এগুলো মাঝে মধ্যেই অসুস্থতার সৃষ্টি করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যক্তিটি পরজীবীগুলোকে মেরে ফেলার জন্য ওষুধ গ্রহণ করে। ম্যালেরিয়া যেখানে সচরাচর দেখা যায় এমন জায়গায় অনেক বছর বাস করার পর একজন ব্যক্তি হয়তো আর তেমন অসুস্থ হবে না। কারণ তার দেহ এই পরজীবীর বিরুদ্ধে লড়াই করার সমর্থ্য অর্জন করেছে। গর্ভবতী নারী, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষা দরকার। কারণ তারা খুব সহজেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে এবং তা জ্বর, রক্তস্বল্পতা এবং পানিশূন্যতার সৃষ্টি করে তাদের জন্য আরও বেশি ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে।

রোগ কীভাবে ছড়ায়?

মশা থেকে সৃষ্ট অসুস্থতা সরাসরি একত্রে বসবাসকারী ব্যক্তি বা পরস্পর স্পর্শ করা ব্যক্তিদের মধ্যে ছড়ায় না। কিন্তু মশা যে ব্যক্তির শরীরে

পরজীবী বা ভাইরাস আছে তাকে কামড়ানোর মাধ্যমে সেই পরজীবী বা ভাইরাস পেতে পারে এবং তারপর অন্য আর একজন ব্যক্তিকে কামড়ানোর মাধ্যমে তা সেই ব্যক্তির মধ্যে বাহিত করতে পারে। তাই পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা প্রায়শই একজনের পর আর একজন পরপর অসুস্থ হয়। কীভাবে মশা রোগ ছড়ায় তা বোঝার মাধ্যমে মশাবাহিত অসুস্থতা থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষা করার বিষয়টি বুঝতে এলাকাবাসীর সহায়ক হবে। যদিও জিকা ভাইরাস মূলত মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। এটি যৌনক্রিয়ার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে। জিকা সাধারণত একটি মৃদু অসুস্থতা, কিন্তু যদি একজন গর্ভবতী নারী জিকা আক্রান্ত হন, তবে তা তার গর্ভের শিশুর প্রচুর ক্ষতি করতে পারে। মশার কামড় রোধ করে ও কনডম ব্যবহার করার মাধ্যমে নারীকে জিকা থেকে রক্ষা করুন।

মশা দ্বারা ছড়ানো সাধারণ অসুস্থতাগুলোর লক্ষণ

মশা দ্বারা ছড়ানো অসুস্থতাগুলোর মধ্যে আছে : ম্যালেরিয়া, পীত জ্বর, ডেঙ্গু , জিকা, চিকুনগুনিয়া, ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস এবং জাপানী এনসেফালাইটিস। প্রতিটিরই মৃদু এবং তীব্র ধরন রয়েছে। এই রোগগুলো প্রায়শই জ্বর, ফুসকুড়ি (Rash) এবং ব্যথার সৃষ্টি করে। একই সময়ে একাধিক ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যাওয়া সম্ভব।

কোনো মশাবাহিত অসুস্থতা কি এটি?

জ্বর আছে কি?

* প্রথমে জ্বর, পরে শীত শীত লাগা, তারপর আবার জ্বর। এটি ম্যালেরিয়ায় সাধারণত দেখা যায়। ডেঙ্গু এবং পীত জ্বরে হয়তো জ্বর ছাড়াও শীত শীত লাগা অনুভূত হতে পারে।

* জ্বর দ্রুত আসে, মাথা ও দেহ ব্যথা করে। পীত জ্বর, ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়া প্রায় সময়েই এইভাবে শুরু হয়। জাপানী এনসেফালাইটিসও হঠাৎ জ্বর দ্বারা শুরু হতে পারে।

* ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার জ্বর সাধারণত তীব্র হয় – ৩৮.৫° সে. (১০১° ফা.) বা তারও বেশি। জিকার জ্বর সাধারণত নীচু মাত্রার হয় – ৩৮.৫° সে. (১০১° ফা.) থেকে কম।

* অনেক অসুস্থতাতেই জ্বর দেখা দেয়। জ্বর সম্পর্কে আরও জানতে অসুস্থ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা দেখুন এবং জ্বর সৃষ্টি করে এমন শিশুকালীন অসুস্থতা সম্পর্কে জানতে শিশুদের পরিচর্যা অধ্যায় দেখুন।

ফুসকুড়ি আছে কি?

* জিকার ক্ষেত্রে ফুসকুড়ি (Rash) প্রায় সময়ই দেখা যাবে এবং চিকুনগুনিয়া, ডেঙ্গু এবং ওয়েস্ট নাইল জ্বরের ক্ষেত্রে ফুসকুড়ি দেখা যাওয়া একটি সাধারণ ব্যাপার। ম্যালেরিয়া, পীত জ্বর বা জাপানী এনসেফালাইটিস-এর ক্ষেত্রে সাধারণত ফুসকুড়ি দেখা যায় না।

* ফুসকুড়ি হাম বা মশাবাহিত নয় – এমন অন্যান্য সাধারণ অসুস্থতার লক্ষণও হতে পারে।

অস্থি ও সন্ধিতে কোন ব্যথা আছে কিনা?

* ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া এবং জিকায় সাধারণত দেহে ব্যথা ও বেদনা থাকে। ম্যালেরিয়ায় ব্যথা সাধারণত থাকেই না। অস্থিতে বা পেশিতে ব্যথা হলে তা খুব সম্ভব ডেঙ্গু এবং ব্যথাসহ ফুলে যাওয়া সন্ধি খুব সম্ভব চিকুনগুনিয়ার লক্ষণ।

* সন্ধিতে ব্যথা আঁটুলিবাহিত ভাইরাসসহ অন্য কোন সমস্যার লক্ষণ হতে পারে – যেগুলো মশাবাহিত নয়।

চোখ লাল ও জ্বালা করে?

* জ্বালা করা চোখ জিকার সাধারণ লক্ষণ এবং কোন কোন সময় চিকুনগুনিয়া ও পীত জ্বরেও তা দেখা যায়।

মশাবাহিত যেসব অসুস্থতার জন্য জরুরি সাহায্য প্রয়োজন

* গুরুতর ম্যালেরিয়া, গুরুতর ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস বা গুরুতর জাপানী এনসেফালাইটিস-এর ক্ষেত্রে খিঁচুনি এবং জ্ঞান লোপ পাওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে।

* গুরুতর পীত জ্বর বা গুরুতর ডেঙ্গু থেকে দেহের ভিতরে বা মুখ, মাঢ়ী, নাক, চোখ বা ত্বক থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে। অভিঘাতের লক্ষণগুলো খেয়াল করুন : ত্বক ঠাণ্ডা হয়ে যায়, রক্তচাপ কমে যায় এবং নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত হয়। ফুলে ওঠা পেটও অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের একটি লক্ষণ হতে পারে।

জ্বরের মাত্রা যদি ৪০° (১০৪° ফা.) হয় তবে একজন স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে শীঘ্রই দেখা করুন। তাপমাত্রা যদি তার থেকেও বেশি হয় তবে তা একটি জরুরি অবস্থা।

আপনার ম্যালেরিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে এবং আপনি গর্ভবতী হলে, আপনি যদি একটি শিশুর মশাবাহিত রোগ হয়েছে বলে ধারণা করেন বা কোন বয়স্ক ব্যক্তির বা সঙ্কটজনক স্বাস্থ্য সমস্যাযুক্ত ব্যক্তির অসুস্থতা থাকলে অবশ্যই একজন স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে দেখা করুন। যদি বেদনাদায়ক ব্যথা ২ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে থাকে বা আপনার পা, বাহু বা মুখে গুরুতর দুর্বলতা থাকে, টন টন করে বা কোন অনুভূতিই না থাকে তবে একজন স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে দেখা করুন। এটি হয়তো গিয়া-বারে সিন্ড্রোমের একটি লক্ষণ হতে পারে – যা মশা থেকে সৃষ্ট অসুস্থতার পরপরই হতে পারে এমন একটি গুরুতর অবস্থা। এটির সব থেকে ভাল চিকিৎসা করা যায় হাসপাতালে।

আপনার মশাবাহিত কোন রোগ হলে কী করা উচিত? যেহেতু এই অসুস্থতার লক্ষণগুলো প্রায় একই রকমের, তাই ব্যক্তির কোন রোগটি হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। এটি যদি ম্যালেরিয়া হয়ে থাকে তবে আর দেরী না করে ম্যালেরিয়া পরীক্ষা করলে ব্যক্তির জন্য দ্রুত ম্যালেরিয়ার ওষুধ শুরু করা সম্ভব হবে। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যদি সে গর্ভবতী, খুবই কম বয়সী বা বয়স্ক ব্যক্তি হয় বা তার এইচআইভি (HIV) থাকে। জিকা হতে পারে এমন একজন নারীর সেরে না ওঠা পর্যন্ত সন্তান নিতে দেরী করা উচিত। গর্ভাবস্থায় জিকা বিপজ্জনক হতে পারে।

অসুস্থতা কোনটি তা আপনি যদি না-ও জানেন তবুও অসুস্থতা লঘু থাকলে জলপূর্ণতা, বিশ্রাম এবং পারাসিটামল (এসিটামিনোফেন) দ্বারা এর চিকিৎসা করুন। অসুস্থ অবস্থায় রোগী যদি খারাপ অনুভব করেন বা সেরে না ওঠে তবে একজন স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে দেখা করুন।

মশা দ্বারা সৃষ্ট অসুস্থতা রোধ করা

অসুস্থতা রোধ করতে যে সমস্ত জায়গায় মশা বংশবৃদ্ধি করতে পারে সে সমস্ত জায়গা পরিষ্কার করুন এবং জল রাখার পাত্রগুলো ঢেকে রাখুন।

যে সমস্ত এলাকায় পীত জ্বর বা জাপানী এনসেফালাইটিস দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের টিকা দেয়ার মাধ্যমে এই অসুস্থতাগুলো রোধ করা যায়। যেখানে মশা মারার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করা হয় সেখানে আপনি কীভাবে সেগুলো ব্যবহার করেন সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন। কারণ কীটনাশক মানুষ ও পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে। মশার কামড় রোধ করা এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে মশার বংশ বিস্তার রোধ করা আরও বেশি নিরাপদ ও আরও কার্যকর হতে পারে।

ম্যালেরিয়া

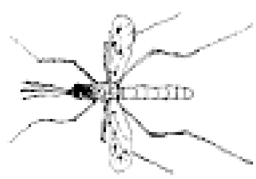

ম্যালেরিয়ার মশার দাগযুক্ত পাখা থাকতে পারে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাতে কামড়ায় এ রকম মশার (নাম এ্যানোফিলিস) মাধ্যমে মানুষের মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়া একটি পরজীবীর (প্লাসমোডিয়াম বলা হয়) কারণে ম্যালেরিয়া হয়। সাধারণ ম্যালেরিয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (জটিলতাহীন ম্যালেরিয়া বলা হয়) জ্বর ও শীত লাগার চক্রগুলো অস্বস্তিকর হয় কিন্তু চিকিৎসা করলে এগুলো কয়েক দিনের মধ্যে চলে যায়। কিন্তু চিকিৎসা না করা হলে ম্যালেরিয়া দ্রুত মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এটিকে বলা হয় গুরুতর ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া হয় এমন অঞ্চলগুলোতে মানুষের ব্যাখ্যাহীন জ্বর হলে রক্ত পরীক্ষার জন্য তাদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়া উচিত। পরীক্ষায় যদি ম্যালেরিয়া পাওয়া যায় বা যদি পরীক্ষা করার কোন ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকে চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা করান।

ভিন্ন ভিন্ন পরজীবীর কারণে ফ্যালসিপেরাম, ভাইভাক্স এবং অন্যান্য ম্যালেরিয়ার ধরন দেখা যায়। আপনি যে এলাকায় বাস করছেন সেখানে কোন ধরনের ম্যালেরিয়া বিদ্যমান এবং কোন ওষুধ সব থেকে ভাল কাজ করবে তা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ভাল করে জানে। ওষুধ ছাড়া ম্যালেরিয়া বার বার ফিরে আসবে। কারণ পরজীবীগুলো মানুষের যকৃতে থেকে যায়। পরজীবীগুলোকে মেরে ফেলার মাধ্যমে ওষুধ ব্যক্তিকে সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

ম্যালেরিয়া কোলের শিশু, ৫ বছরের নীচে শিশু, গর্ভবতী নারী এবং এইচআইভিযুক্ত মানুষদের জন্য বিশেষভাবে বিপজ্জনক। যখন গর্ভধারণ বা এইচআইভি বা অন্য কোন অসুস্থতা মানুষের দেহের পক্ষে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করা কঠিন করে তোলে, তখন ম্যালেরিয়া হওয়া বা গুরুতর ম্যালেরিয়া শুরু হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

জটিলতাহীন ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়ার সাধারণ উপসর্গ হলো জ্বর – যা আসে ও যায় এবং প্রতিবারই শীত শীত লাগে। কখনো কখনো জ্বর নেমে যাওয়ার সময় ব্যক্তির ঘাম ঝরে। যদিও ম্যালেরিয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই এই উপসর্গ হয় না। অন্যান্য লক্ষণগুলো সচরাচর দেখা যায় কিন্তু তা সকলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না।

জটিলতাহীন ম্যালেরিয়া

* জ্বরের মাত্রা মৃদু হতে পারে কিন্তু প্রায়শই উঁচু হয়, – ৩৯° (১০২° ফা) বা তারও বেশি।
* শীত শীত লাগে এবং ঘাম ঝরে।
* মাথা এবং গায়ে ব্যথা।
* গা গুলায়, বমি হয়, ক্ষিধে থাকে না।
* রক্তস্বল্পতা থেকে ফ্যাকাশে হওয়া ও দুর্বলতা।
* মৃদু কামলা (হালকা রঙের ব্যক্তির চোখের সাদা অংশে বা ত্বকে হলুদ হওয়া)।
* বর্ধিত হওয়া প্লিহা (একজন স্বাস্থ্যকর্মী একজন ব্যক্তির পেট পরীক্ষা করে এটি অনুভব করতে পারে)। ম্যালেরিয়ার মশার দাগযুক্ত পাখা থাকতে পারে।

কারো ম্যালেরিয়া হয়েছে কিনা রক্ত পরীক্ষায় তা নিশ্চিত করা যায়। কোন কোন ম্যালেরিয়ার পরীক্ষার জন্য একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় কিন্তু অনেক এলাকা ভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মী দ্রুত পরীক্ষার সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে – যেটায় শুধুমাত্র এক ফোঁটা রক্ত প্রয়োজন হয়। যেহেতু চিকিৎসা না করা ম্যালেরিয়া কয়েক বছরের মধ্যে বেশ কয়েকবার জ্বর ও শীত শীত লাগার সৃষ্টি করতে পারে তাই ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করুন যে তার সাম্প্রতিক মাসগুলোতে একই রকমের লক্ষণ দেখা গিয়েছে কিনা।

জটিলতাহীন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা

রক্ত পরীক্ষায় নিশ্চিত হলে রোগী ও চিকিৎসা উভয়ের জন্য তা স্বস্তিদায়ক হতে পারে। যদি আপনার এলাকায় পরীক্ষা করার ব্যবস্থা না থাকে তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ম্যালেরিয়ার ওষুধ ব্যবহার করা শুরু করুন। পি ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়াযুক্ত এলাকায় চিকিৎসা ততক্ষণাৎ শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু মশা ম্যালেরিয়া ছড়ায় তাই একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করলে অন্যরা সংক্রামিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবেন।

আপনার স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ম্যালেরিয়ার কোন ওষুধটি ব্যবহারের সুপারিশ করে তা জানুন। অনেক অঞ্চলেই ম্যালেরিয়া

কোন কোন পুরাতন ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলেছে। তার মানে হলো, যে ওষুধগুলো একসময় ম্যালেরিয়া রোধ করা বা এর চিকিৎসা করায় কাজ করতো সেগুলো এখন আর কাজ করে না। যে ওষুধগুলো একটি অঞ্চলের ম্যালেরিয়া সারিয়ে তোলে সেটি হয়তো অন্য একটি জায়গায় বিদ্যমান ম্যালেরিয়া সারিয়ে তোলায় কাজ না-ও করতে পারে।

দ্রুত রোগ নির্ণয় পরীক্ষা (আরডিটি) এক ফোঁটা রক্ত ব্যবহার করে ম্যালেরিয়ার পরীক্ষা করে। ব্যক্তিটি যদি ইতোমধ্যেই ম্যালেরিয়ার ওষুধ গ্রহণ করে থাকে, তবে পরীক্ষাটি সঠিক ফলাফল দিতে নাও পারে।

ম্যালেরিয়াযুক্ত একজন ব্যক্তিকে বিশ্রাম নিতে হবে এবং পরিষ্কার জল, স্যুপ এবং যদি জ্বর, বমি, বা ডায়রিয়া থাকে তবে জলপূর্ণতার পানীয়ও পান করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ! আপনি ভাল অনুভব করলেও চিকিৎসকের সুপারিশ করা সকল ওষুধ গ্রহণ করুন। আপনি যদি ওষুধ নেয়া বন্ধ করেন তবে ম্যালেরিয়া আবারও ফিরে আসতে পারে এবং ওষুধগুলো তখন হয়তো আর কোন কাজ না-ও করতে পারে।

এই মহিলা তার সব ওষুধ সেবন করেছেন এবং তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

এই মহিলা তার সব ওষুধ শেষ করেননি এবং সেজন্য এখনও অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন।

গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া থেকে সৃষ্ট রক্তস্বল্পতা

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করা না হলে তা রক্তস্বল্পতার সৃষ্টি করে (রক্তে লৌহ কণিকার সংখ্যা কমে যাওয়া)। ক্লান্তি, দুর্বলতা এবং শ্বাসকষ্ট হলো এর কয়েকটি লক্ষণ। গর্ভধারণকালীন এবং ছোট শিশুদের জন্য রক্তস্বল্পতা বিশেষভাবে ক্ষতিকারক। প্রসব সময়ের অনেক আগেই ও আকারে ছোট শিশুর জন্ম ঘটাতে পারে এবং জন্মদানকালীন রক্তক্ষরণকে আরও বেশি বিপজ্জনক করে তোলে।

কোন কোন সময় ম্যালেরিয়া জ্বর, শীত শীত লাগা বা ব্যক্তি যে অসুস্থ তার অন্যান্য কোন লক্ষণের সৃষ্টি করে না। কিন্তু একটি শিশু বা একটি গর্ভবতী নারীর যদি রক্তস্বল্পতা থাকে এবং সেই এলাকায় ম্যালেরিয়া থাকে তবে ম্যালেরিয়ার পরীক্ষা করুন। যখন লৌহযুক্ত খাবার কম খাওয়ার ফলে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয় তখন ঐ খাবারগুলো খাওয়া রক্তস্বল্পতা দূর করায় সাহায্য করে। যদি এর কারণ ম্যালেরিয়া হয়ে থাকে, তবে রক্তস্বল্পতার অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাওয়া ও আরও বেশি ক্ষতিসাধন রোধ করতে যত শীঘ্র সম্ভব ওষুধ দ্বারা ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করা গুরুত্বপূর্ণ।

যে সমস্ত জায়গায় প্রচুর ম্যালেরিয়া হয় সেখানে গর্ভবতী নারীরা ম্যালেরিয়া রোধ করতে সালফাডক্সিন + পাইরিমেথামিন সেবন করতে পারে। এটি প্রায়শই গর্ভধারণকালীন নিয়মিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় দেয়া হয়ে থাকে। গর্ভধারণকালীন প্রথম ৩ মাসের মধ্যে এটি দেবেন না। কিন্তু তারপর গর্ভধারণকালীন বাকি সময়টার জন্য কমপক্ষে ৩ বার দিন।

রক্তস্বল্পতার লক্ষণ

* ফ্যাকাশে মাঢ়ী এবং চোখের পাতার ভিতরের অংশ।
* দুর্বলতা।
* ক্লান্তি
* মাথা ঘুরানো।
* শ্বাস নেয়ায় কষ্ট।
* দ্রুত হৃদস্পন্দন।

রক্তস্বল্পতা পরীক্ষা করতে একটি রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

গুরুতর ম্যালেরিয়া

যদি জটিলতাহীন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করা না হয় বা যথেষ্ট তাড়াতাড়ি এর চিকিৎসা করা না হয় তবে গুরুতর ম্যালেরিয়া দেখা দিতে পারে। গুরুতর ম্যালেরিয়া দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যদি 'প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম' (পি ফ্যালসিপেরাম) নামের পরজীবীর কারণে ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। গুরুতর ম্যালেরিয়াযুক্ত ব্যক্তির হাসপাতালে বা ক্লিনিকে উন্নত পরিচর্যার প্রয়োজন হবে। গুরুতর ম্যালেরিয়া ১ বা ২ দিনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটাতে পারে, বিশেষ করে যদি তা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে যায় – যে অবস্থাকে 'সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া' বলা হয়।

গুরুতর ম্যালেরিয়ার বিপদ চিহ্ন

* এতোই দুর্বল যে রোগী বসতে ও দাঁড়াতে পারে না, সজাগও থাকতে পারে না।
* মানসিক বিভ্রান্তি, শরীরে প্রবল আক্ষেপ বা জ্ঞান হারানো।
* বারবার বমি হওয়া, জল বা বুকের দুধ পান করতে পারে না।
* ঘন শ্বাস ওঠা বা শ্বাস নেয়ায় অসুবিধা
* নীচু রক্তচাপ বা অভিঘাতের অন্যান্য চিহ্ন।
* গাঢ় প্রস্রাব, এবং যকৃতের কাজ না করা শুরু হওয়ায় কম পরিমাণে প্রস্রাব। স্বাস্থ্যকর্মীরা নীচেরগুলোর জন্য রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা করবে :
* রক্ত স্বল্পতা (রক্ত লৌহের পরিমাণ কম থাকা)।
* প্রস্রাবে হিমোগ্লোবিন।
* রক্ত চিনির (গ্লুকোজ) পরিমাণ কম।

গুরুতর ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা

গুরুতর ম্যালেরিয়াযুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের ২৪ ঘন্টা বা তার বেশি সময়ের জন্য শিরায় আর্টেস্যানেট দেয়া বা পেশীতে প্রবিষ্ট করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজন। এই চিকিৎসা দিতে পারা হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকর্মী যদি কাছাকাছি না থাকে তবে আপনি হাসপাতালে যেতে যেতে আপনাকে সাহায্য করায় একজন স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীর হয়তো আর্টেস্যানেট বা কুইনাইন প্রবিষ্ট করানোর প্রশিক্ষণ ও ওষুধ উভয়ই থাকতে পারে। যেখানে প্রবিষ্ট করানোর আর্টেস্যানেট পাওয়া না যায় সেখানে ৬ বছরের নীচে শিশুদের জন্য আর্টেস্যানেট কেপসুল গুহ্যদ্বারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। জরুরি চিকিৎসা ম্যালেরিয়া নিরাময় করে না। আপনার আরও ৩ দিন বা বেশি সময়ের জন্য বাড়তি ওষুধ নেবার প্রয়োজন হবে।

ম্যালেরিয়ার মশা রাতের বেলা কামড়ায়। ম্যালেরিয়া রোধ করতে কীটনাশক মেশানো মশারি ব্যবহার করে ঘুমান। ছোট শিশুদের দোলনা ও মশারি দিয়ে ঢেকে দিন।

ম্যালেরিয়া রোধ করা

ম্যালেরিয়া রোধের জন্য কোন টিকা নেই। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ কখনও কখনও এটি রোধ করতে ব্যবহার করা হয়। বিশেষভাবে মানুষ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণ করে। ম্যালেরিয়া রোধ করার মাত্রা হয়তো প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক হতে পারে। কোন কোন দেশে ম্যালেরিয়া রোধে গর্ভধারণকালীন শেষ ৬ মাসে (সালফাডক্সিন + পাইরিমেথামিন) ওষুধ ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত দেশে শুধুমাত্র বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া দেখা যায় সেখানে হয়তো কার্যক্রমগুলো প্রতি বছর মাত্র কয়েক মাস সময়ের জন্য শিশুদেরকে ম্যালেরিয়া রোধের ওষুধ দিতে পারে।

ম্যালেরিয়া রোধ করার সব থেকে ভাল উপায়গুলোর একটি হলো কীটনাশক মেশানো মশারি ব্যবহার করে ঘুমানো। এই মশারিগুলোতে এক বা একাধিক কীটনাশক প্রয়োগ করা হয় যেগুলো তুলনামূলকভাবে নিরাপদ – বিশেষ করে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হবার সাথে তুলনা করলে। কীভাবে মশারি ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য মশাবাহিত অসুস্থতা রোধ করে সে সম্পর্কে আরও জানুন।

বিনামূল্যে কীটনাশক মেশানো মশারি বিতরণ করে আর ঘরের মধ্যে কীটনাশক ছিটানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ব্যবহার করে এমন ধরনের প্রচারণা ম্যালেরিয়া রোধ করতে পারে – যদি এলাকার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক পরিবার এই কর্মসূচীর সাথে নিজেদেরকে জড়িত করে। আপনি ম্যালেরিয়ার মশার বংশবৃদ্ধি হওয়া রোধ করতে পারেন বা এগুলোর ডিম ফোটা রোধ করতে পারেন। মশার কামড় এড়িয়ে চলা সবসময়েই এগুলো যে রোগ ছড়ায় সেগুলো রোধ করায় সাহায্য করবে।

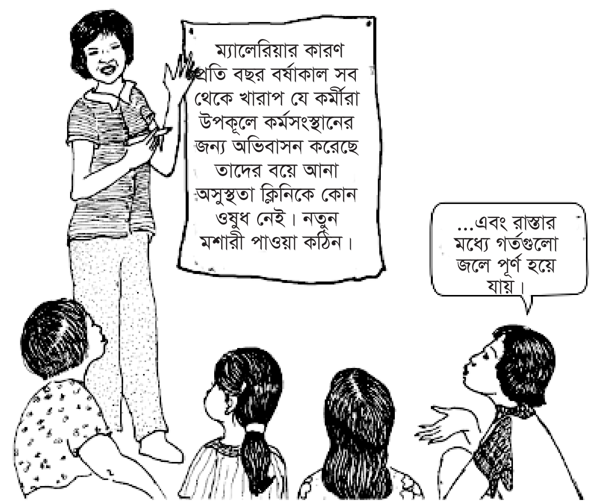

যেখানে লোকের রক্ত পরীক্ষা করে না ও ওষুধ কেনার সামর্থ্য নেই সেখানে ম্যালেরিয়া সব থেকে বেশি দেখা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তির ম্যালেরিয়া থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্থানীয় মশার মাধ্যমে সংক্রমণটি অন্যান্যদের মধ্যে ছড়াতে পারে। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ প্রচারণা সার্থক হতে হলে এগুলোকে দারিদ্র্য ও অন্যায্যতার মূল কারণগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে এবং সকলের জন্য চিকিৎসা সহজলভ্য করতে হবে।

▲গণস্বাস্থ্য

[চলবে]

পৃথিবী, পরিবেশ, মানুষ ও খাদ্য

শেষের পথে বন

গাছ থেকে কাঠ আসে যা কাগজ তৈরির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। তাছাড়া গাছ মাটির ক্ষয়রোধে সহায়তা করে, ভূগর্ভস্থ জলের আধার পূর্ণ রাখে এবং প্রকৃতি থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নিয়ে আমাদের জন্য অক্সিজেন জোগায়। তা সত্ত্বেও প্রতি বছর বিশ্বে ৩৩ লাখ হেক্টর বন নষ্ট হচ্ছে, মানুষের অপরিমিত ভোগের কারণে।

সংবাদ পরিষেবা, মার্চ ২০১৯

মেসার্স মা ট্রেডিং কার্গো (প্রাঃ) লিঃ

M/S Maa Trading Cargo (Ptv.) Ltd.

আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ১৯৯০ সাল থেকে অত্যন্ত দক্ষতা ও সততার সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম বিরতিহীনভাবে বিভিন্ন পোর্টে ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং-এর কাজ করে আসছে। আমরা সকল ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রোপ্রাইটর

হাজী মোঃ মনিরুজ্জামান (মনির)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মেসার্স মা ট্রেডিং কার্গো (প্রাঃ) লিঃ

মিতু ভিলা, বাড়ি # ৪৮, বাইতুল ফজল জামে মসজিদ রোড ওয়ার্ড # ৪৮, দত্তপাড়া, ইসলামপুর, টঙ্গী, গাজীপুর।

ফোন : ৮৯২১৪৭৬, মোবাইল : ০১৭১১-৫২৮৩৮০, ০১৯১৯-৫২৮৩৮০

মানবদেহ সম্পর্কে বিস্ময়কর নানা তথ্য

রঞ্জন দাস রায়

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় চাহিদা হলো শারীরিক সুস্থতা। শরীর সুস্থ না থাকলে আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না। আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি কোষ একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মাঝে চলছে। কোনো কারণে এই নিয়মে সামান্য ব্যাঘাত ঘটলে তার প্রভাব পুরো শরীরের উপর পড়ে। প্রত্যেকটা সেকেন্ডেই আমাদের শরীর প্রায় লক্ষ লক্ষ কাজ করছে। একজন গড়পড়তার মানুষ সারাদিন কাজ করে ঘরে এসে ক্লান্তিতে ঠিকই রাতে বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয়। তবে আমরা হাঁপিয়ে উঠলেও আমাদের শরীর কিন্তু কখনো থেমে থাকে না। ঘুমের মধ্যেও আমাদের স্বপ্নে নিমজ্জিত রেখে শরীর তার নানা বিপাকীয় প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে থাকে।

আমাদের দেহ প্রত্যেকটা মুহূর্ত কোনো না কোনো কাজ করতে থাকে। শরীরের সকল স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করে এর নানা উপাদান। অসুস্থ হলে কিংবা কোনো রোগ হলে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। শরীরের এমন নানা ক্রিয়ার মধ্যে অনেক কিছুই আছে যার সম্পর্কে আমাদের অনেকের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আজ এই লেখাটিতে মানবদেহ সম্পর্কে এমনই কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

১. আমাদের শরীরে যে ঘাম হয়, তাতে কিন্তু আসলে কোনো দুর্গন্ধ নেই। মূলত এই লবণাক্ত তরলে ত্বকের নানা ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে। ঘাম থেকেই এই ব্যাকটেরিয়াগুলো তাদের খাদ্য আহরণ করে। আর ঘামেই এদের বর্জ্য ত্যাগ করে। ব্যাকটেরিয়ার এই বর্জ্য থেকেই ঘামে দুর্গন্ধ হয়।

২. আমাদের শরীরের যেখানে হাড়ের সন্ধি আছে, যেমন হাত, পা, ঘাড় ইত্যাদিতে আমরা কটমট শব্দ তৈরি করতে পারি। দুই হাতের আঙুলগুলো একত্র করে ভাঁজ করলে এমন কটমট শব্দ হয়। একে আমরা হাত ফুটানো বলে থাকি। কখনো কি ভেবেছেন এ রকম শব্দ কেন হয়?

আমাদের শরীরের সন্ধিতে এক ধরনের তরল থাকে। এদের সাইনোভিয়াল ফ্লুইড (Synovial Fluid) বলে। কোমড়, ঘাড় ও বাহুর সন্ধিগুলোতে এই তরলের বুদবুদ তৈরি হয়। সন্ধিতে আমরা যখন একটু চাপ প্রয়োগ করি, তখনই এই বুদবুদ ফুটে ওঠে আর শব্দ তৈরি হয়।

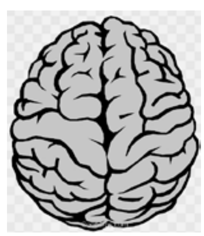

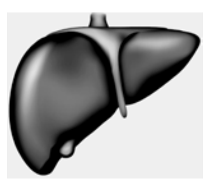

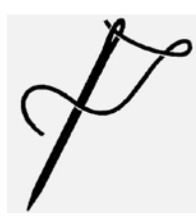

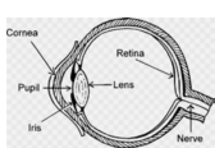

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এমন হাড় ফুটানো শরীরের জন্য ক্ষতিকর কি না। প্রকৃতপক্ষে এর কোনো খারাপ প্রভাব নেই। তবে ক্রমাগত এই কাজ করতে থাকলে লিগামেন্ট (হাড়ের নমনীয় সন্ধিস্থান) আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে।

৩. হেটেরোক্রোমিয়া বা কর্বুরতা (Heterochromia) একটি বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্য, যার কারণে একটি প্রাণীর দুটি ভিন্ন রঙের চোখ থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য বিরল হলেও কিছু প্রজাতির কুকুরের মাঝে এটি প্রায়ই দেখা যায়। বেশ কয়েকজন হলিউড অভিনেতার এই হেটেরোক্রোমিয়া রয়েছে।

৪. মস্তিষ্ক আমাদের দেহের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় অঙ্গ। কুঞ্চিত এই অঙ্গটিকে যদি সম্প্রসারিত করা হয়, তাহলে এটি একটি বালিশের সমান আকার ধারণ করতে পারে। আর ছয় বছর বয়সের মধ্যেই আমাদের মস্তিষ্ক প্রায় ৯০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

৫. যকৃত আমাদের দেহের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। একে আমাদের শরীরের পাওয়ার হাউজ বলা হয়। এই যকৃতের কিন্তু এক বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। কোনো দুর্ঘটনার কারণে বা সার্জারির সময় যদি যকৃতের অংশবিশেষ কেটে ফেলা হয়, তবে এটি আপনাআপনি কেটে যাওয়া অংশ পুনরুৎপাদন করতে পারে। এভাবে এটি একেবারে তার আগের স্বাভাবিক আকারে ফিরে আসার ক্ষমতা রাখে।

৬. একটি সূচের মাথায় মানবদেহের প্রায় দশ হাজার কোষ স্থাপন করা সম্ভব।

৭. আমাদের শরীরে মাত্র একটি অঙ্গ রয়েছে যাতে রক্ত পরিবাহিত হয় না। আর এটি হলো আমাদের চোখের কর্নিয়া। সরাসরি বাতাস থেকে এটি নিজের জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করে। তাহলে চিন্তা করে দেখুন, অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে দীর্ঘ সময় থাকলে কিন্তু আমাদের চোখের ক্ষতি হতে পারে।

৮. আমাদের শরীরে যে পরিমাণ ফ্যাট বা চর্বি রয়েছে, তা দিয়ে প্রায় সাতটি বড় আকৃতির সাবান তৈরি করা সম্ভব।

৯. একজন নারীর গর্ভধারণের তিন মাসের মধ্যেই ভ্রূণের ফিঙ্গারপ্রিন্ট তৈরি হয়ে যায়।

১০. জন্ম নেওয়ার সময় একটি নবজাতক ৩০০টি হাড় নিয়ে জন্মায়। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর হাড়ের এই সংখ্যা ২০৬-এ নেমে আসে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বাচ্চার কিছু হাড় জোড়া লেগে একটি হাড়ে পরিণত হয়। আর আমাদের শরীরের মোট হাড়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ কেবল পায়ের পাতাতেই রয়েছে।

১১. আমরা যখন খুব লজ্জা পাই কিংবা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ি, তখন আমাদের মস্তিষ্কে অ্যাড্রেনালিন হরমোন ক্ষরণ হয়। একই সাথে আমাদের হৃদকম্পনও বেড়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের ত্বকের রক্তনালিগুলোতে রক্তপ্রবাহ সামান্য পরিমাণে বাড়তে থাকে। একেই মূলত আমরা ‘লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া’ বলি।

১২. মানবদেহের কিছু টিউমার রয়েছে যেগুলোর নিজেদের দাঁত ও চুল তৈরি হতে পারে। এ ধরনের টিউমারকে বহুজনি অর্বুদ বা (Teratoma) বলে।

১৩. মানুষের শরীরের জৈবসন্দিপ্তী বা বায়োলুমিনিসেন্স (Bioluminescence)-এর ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ মানব শরীর থেকে অতি অল্প পরিমাণে আলো নির্গত হয়। তবে এই আলো খালি চোখে দেখা যায় না।

১৪. মহাকাশে ভ্রমণরত নভোচারীদের উচ্চতা প্রায় দুই ইঞ্চি পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ভরশূন্য পরিবেশে থাকার কারণে তাদের মেরুদন্ড সামান্য পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়। তবে পৃথিবীতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর এই উচ্চতা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে।

১৫. আমাদের মস্তিষ্ক সর্বোচ্চ দশ মিনিট অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে।

১৬. অনাহারে থাকার মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছালে আমাদের মস্তিষ্ক নিজেই নিজেকে ভক্ষণ করতে শুরু করে। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus) ও নিউরনের কোষ নিজেরাই নিজেদের ভক্ষণ করে। এই প্রক্রিয়াকে আত্মস্বাদন বা স্বভোজন (Autophagia) বলে।

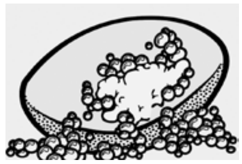

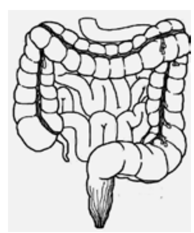

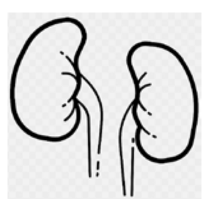

১৭. মানবদেহের ক্ষুদ্রান্ত্র দেহের ভেতর প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। একে সম্প্রসারণ করলে প্রায় ২৩ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

১৮. আমাদের দেহে জোড়ায় জোড়ায় যত অঙ্গ রয়েছে, তাদের যেকোনো একটি বাদ দিলেও আমরা বেঁচে থাকতে পারবো।

১৯. আমাদের দেহে প্রায় এক লক্ষ মাইলের সমপরিমাণ রক্তশিরা রয়েছে।

২০. আমরা একই সাথে নিঃশ্বাস নিতে ও খাদ্য গলাধঃকরণ করতে পারি না। এর চেষ্টা করাও কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ তা করতে গেলে শ্বাসনালীতে খাদ্য প্রবেশ করার ঝুঁকি রয়েছে।

২১. আমাদের শরীরের ভেতর বাম কিডনি ডান কিডনি হতে সামান্য উপরে অবস্থিত।

২২. গর্ভকালীন সময়ে একজন নারীর ভুলে যাওয়ার প্রবণতা (Dementia), অমনোযোগিতা ইত্যাদি বেড়ে যায়। এ সময় তাদের মস্তিষ্কও কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়ে।

২৩. আমাদের পাকস্থলীতে যে এসিড থাকে, তা ধাতু গলিয়ে দিতে সক্ষম। আবার এই এসিড আমাদের ত্বকের উপর ফেললে তা ত্বক পুড়িয়ে ভেতরে চলে যাবে।

২৪. জীবনের কোনো না কোনো সময় ঠিকই আমাদের শরীর ক্যান্সারের সাথে লড়াই করেছে।

২৫. একজন মানুষ তার পুরো জীবনে যতটুকু মুখের লালা উৎপন্ন করে, তা দিয়ে অন্তত দুটি সুইমিং পুল ভরে ফেলা সম্ভব।

২৬. মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্টের মতো জিহ্বার প্রিন্টও একজনেরটা আরেকজনের থেকে আলাদা।

২৭. ছোট শিশুরা মিনিটে এক বা দু'বার চোখ পিট পিট করে, যেখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মিনিটে দশবার এই কাজটি করে।

২৮. আমাদের উরু বা রানের হাড় ফিমার হলো পুরো শরীরের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী অঙ্গ।

২৯. আমাদের মস্তিষ্ক একটি বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানোর সমান বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে।

৩০. একটি ক্যামেরার ক্ষমতা অনুযায়ী বিচার করলে আমাদের চোখ ৫৭৬ মেগাপিক্সেল (Megapixel) ক্যামেরার সমান।

৩১. এখন পর্যন্ত জ্বর হওয়ার কারণে দেহের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ১১৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত বেড়ে যাওয়ার রেকর্ড রয়েছে।

৩২. আমাদের হাতের সমস্ত শক্তির প্রায় অর্ধেক আসে আমাদের কনিষ্ঠ আঙুল থেকে।

৩৩. পুরুষদের অন্ডকোষ শরীরের বাইরে থাকে, কারণ দৈহিক তাপমাত্রায় শুক্রাণু বাঁচতে পারে না।

৩৪. মানুষ কখনো ঘাস হজম করতে পারে না। এর কারণ হলো, ঘাসের মধ্যে যে বিটা সেলুলোজ থাকে, তা ভাঙার মতো এনজাইম মানুষের পাকস্থলীতে থাকে না, যে এনজাইম কিনা গরু, ছাগল ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণীর থাকে।

৩৫. একজন গড়পড়তা মানুষের নাভিতে প্রায় ৬৭ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে।

৩৬. প্রতি বছর আমাদের অন্তত চার কেজির সমপরিমাণ ত্বকের কোষ ঝরে যায়।

৩৭. মানুষের দাঁত একটি হাঙরের দাঁতের সমপরিমাণ শক্তিশালী।

৩৮. আমাদের শরীরের প্রায় ৮ শতাংশ ওজন আসে আমাদের রক্ত থেকে।

৩৯. যে এনজাইমগুলো মানুষকে তার খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে, মৃত্যুর পর সেই এনজাইমগুলোই মৃতদেহকে পরিপাক করা শুরু করবে।

৪০. আমাদের পাকস্থলির আবরণ ৩-৪ দিনের মধ্যে আপনাআপনি পরিবর্তিত হয়, যাতে পাকস্থলি নিজেই নিজেকে পরিপাক করে না ফেলে।

অত্যন্ত রহস্যময় বস্তু আমাদের এই শরীর। এর প্রত্যেকটি অংশ অনেক সূক্ষ্মভাবে নকশা করা। এই দেহ সম্পর্কে মানুষ কখনোই পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি। চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রত্যেকবারই কোনো না কোনো নতুন বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করছেন। আমাদের নিজেদের কাছে আমাদের শরীরের অগ্রাধিকার সবচেয়ে বেশি। এই শরীরের প্রত্যেকটি কোষ নিরলসভাবে কাজ করছে আমাদের দৈনন্দিন জীবন স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য।

▲গণস্বাস্থ্য

[লেখকের অনুমতিক্রমে তাঁর ব্লগ থেকে]

করোনা

ডেঙ্গু, ব্যথা, সাধারণ জ্বর ও মাসিকের যাতনা নিরসনের সুলভ ও উন্নতমানের ওষুধ

দেশের স্বাস্থ্যের জন্যে

২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ৬ টেবলেট নিরাপদ

G–Paracetamol 500 mg Tablet

MRP প্রতি টেবলেট ০.৮০ টাকা

গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ লিমিটেড

মির্জানগর ভায়া- সাভার ক্যান্ট., সাভার, ঢাকা-১৩৪৪

ফোন : ৯৬১২৫০৯, ৯৬৬২৯৯১,৯৬৬২৯৮০

ই-মেইল: gplppm@yahoo.com , gplmkt@yahoo.com

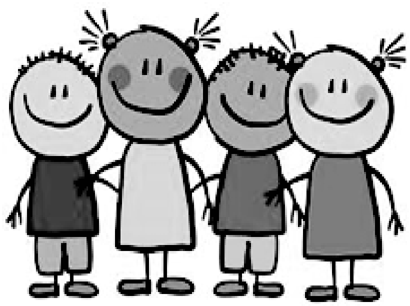

'মাসিক গণস্বাস্থ্য' পত্রিকায় একসময় 'ছোটদের পাতা' নামে একটি বিভাগ ছিল এবং প্রতি সংখ্যাতেই বিভাগীয় লেখা নিয়ে পাঠকদের সামনে উপস্থিত হতো। ছোটদের কাছেও বিভাগটি যথেষ্ট প্রিয় ছিল। নানা কারণে দীর্ঘকাল এই বিভাগ আমরা চালু রাখতে পারিনি। কিন্তু শিশু-কিশোর পাঠকদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করে এখন থেকে 'শিশু-কিশোর' বিভাগটি নিয়মিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-ধাঁধা ইত্যাদি নিয়ে আবার তোমাদের সামনে হাজির হবে। শুধু তা-ই নয়, যাদের জন্য এই বিভাগ; তারাও এতে লেখা, অংকের ধাঁধা, কোন বিজ্ঞান যাদুঘর দেখে তার বয়ান বা এ রকম কিছু বিষয়ের ওপর লিখে নিজেরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে। আপাতত এর জন্য দুটি পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হলেও আগামীতে তোমাদের আগ্রহের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা আরো বাড়ানো হবে।

*এই বিভাগটি সার্বিকভাবে দেখাশোনা করবেন **অনুসন্ধিৎসু চক্র** বিজ্ঞান সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য **ড. আমানুল ইসলাম**। তোমরা ইচ্ছে করলে তাঁর কাছে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন করতে পারো। প্রশ্ন গৃহীত হলে প্রশ্নকর্তার নামসহ উত্তর ছাপা হবে।*

শিশু-কিশোর বিভাগ

মাথায় কত প্রশ্ন আসে!

সময়ের পরিক্রমায় কাগজ কেন হলুদাভ হয়ে যায়?

তোমরা অনেকে নিশ্চয় খেয়াল করে দেখেছো যে, কাগজ বা বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো সময়ের সাথে সাথে ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে হলদে বাদামী হয়ে যায়। কেন এমনটা হয় কখনো ভেবেছো কি? কাগজ তৈরি হয় কাঠের মন্ড থেকে। তাতে থাকে লিগনিন নামক জটিল জৈব পলিমার। কাঠের অধিকাংশ শক্তিমত্তা ও কাঠিন্যের জন্য দায়ী গাঠনিক এই উপাদানটি। লিগনিন খুব সহজে বায়ুতে জারিত হয়ে হলুদ বা বাদামী বর্ণ ধারণ করে। আমরা যে-সংবাদপত্র পড়ি (অন্যান্য কাগজও এর ভেতরে আছে), সেই নিউজ পেপারে প্রচুর পরিমাণে লিগনিন থাকে এবং দ্রুত হলুদ বর্ণ ধারণ করে। উঁচু গ্রেডের কাগজে রাসায়নিক উপায়ে বেশিরভাগ লিগনিন অপসারণ করা হয় ও ব্লিচড করা হয়। কিন্তু সাধারণত স্বল্প পরিমাণে লিগনিন রয়েই যায়।

রাতের আকাশে কত তারা বা নক্ষত্র আমরা দেখি?

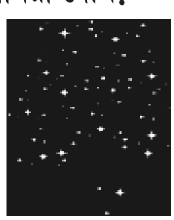

রাতের আকাশের দিকে তাকালে উপরে, চারদিকে কালো ক্যানভাসজুড়ে সাদা বিন্দুর মতো কত তারার মেলা দেখতে পাই। কিন্তু কতগুলো তারা আসলে আমাদের খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায়? সংখ্যাটা অবাক করার মতো।

এমন একটি রাতের কথা ভাবা যাক যেখানে নেই কোন চাঁদ, নেই অন্য কোন আলোর উৎস। তোমাদের দৃষ্টিশক্তি যদি খুব শক্তিশালী হয় তাহলেও খালি চোখ দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে একসাথে ২০০০-২৫,০০০ টি তারার বেশি দেখতে পাবে না।

ভাষা শিখলে আমাদের মস্তিষ্কে কী ঘটে?

মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল আয়তন ও কার্যকারিতার দিক থেকে বৃদ্ধি পায়। যেমন-ব্রকাস অঞ্চল। এটি মস্তিষ্কের বাম হেমিস্ফেয়ার বা গোলার্ধে অবস্থিত ও ভাষা উৎপাদনে সম্পৃক্ত। যখন কোন শিশু দ্বিভাষিকভাবে বড় হয়, উভয় ভাষা একই অঞ্চলে প্রক্রিয়াজাত হতে থাকে। যদিও যখন কোন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ দ্বিতীয় কোন একটি ভাষা শেখে, প্রথমটির নিকটবর্তী পৃথক একটি অঞ্চলের উৎপত্তি ঘটে।

কিছু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অন্যান্যদের তুলনায় দ্রুতই ভাষা শেখেন। এক গবেষণায় দেখা গেছে, পরিবর্তিত মস্তিষ্ক অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যারা দ্রুত ভাষা শেখেন তাদের হিপ্পোকম্পাস (Hippocampus-মস্তিষ্কের অংশবিশেষ) ও ব্রকাস অঞ্চলে বেশি পরিবর্তন ঘটে। আর যারা ধীর গতিতে ভাষা শেখেন তাদের মোটর কর্টেক্স (Motor cortex)-এ পরিবর্তন ঘটে। তবে এর কতক প্রভাব ব্যক্তির প্রথম ভাষার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরপ, জাপানি ভাষীরা (যাদের প্রথম ভাষা জাপানি) যখন ইংরেজি ভাষা শেখেন তখন 'r' ও 'l' এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। কারণ তাদের মস্তিস্কে উভয় অক্ষর দুটির শব্দ একই অঞ্চল থেকে সক্রিয় হয়। কিন্তু যারা ইংরেজি ভাষায় কথা বলেন (যাদের প্রথম ভাষা ইংরেজি) তাদের ক্ষেত্রে শব্দ দুটি পৃথক অঞ্চল থেকে সক্রিয় হয়।

সাধারণভাবে বললে বলা যায়, কোন নতুন ভাষা শেখা মস্তিস্কের কার্যকারিতার উন্নতি সাধন করে, উন্নত স্মৃতি, অধিক মানসিক নম্যতা ও সৃষ্টিশীলতা আনয়ন করে এবং স্মৃতিভ্রংশ (Dementia)-এর সূচনাকে বিলম্বিত করে।

আমাদের নাভি কেন গন্ধময়?

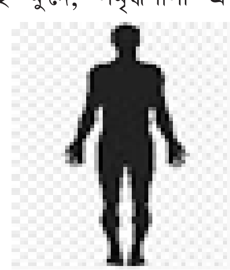

আমাদের প্রত্যেকের নাভিতে রয়েছে ক্ষুদে, সমৃদ্ধশালী এক বাস্তুতন্ত্র। গুরুত্বপূর্ণ এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে এতে রয়েছে ১০০ রকমের ব্যাকটেরিয়ার বসতি (যদিও গড়ে পরিমাণটি হবে ৬০ ধরনের)।

কিন্তু এত্তো সংখ্যক কেন? একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, নাভি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া থাকার আকর্ষণীয় এক আস্তানা। কারণ- ভাঁজযুক্ত আরামপ্রদ ত্বক, দূরীভূত করে দেবার জন্য তেমন একটা বাতাসও থাকে না এবং আমরা সবসময় নাভির

অভ্যন্তরে ভালো করে পরিষ্কার করি না বলে ব্যাক্টেরিয়ারা প্রায় নিরুপদ্রবে সেখানে থাকে।

অধিকাংশ সময় এরা অল্প সংখ্যায় অবস্থান করে। কিন্তু ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধি করার একবার সুযোগ পেলে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এমনটা বেশি ঘটার সম্ভাবনা থাকে যদি নাভিটি ভেতরমুখী হয় বা তাতে কোন ছিদ্র থাকে (যা অনাহুত অতিথিদের জন্য আবাসস্থলে থাকা উপযুক্ত এক গহ্বর)। ব্যাকটেরিয়ার প্রাচুর্যতা, তার সাথে ঘাম, ও নরম লোমে লেগে থাকা ময়লা নাভিতে খানিকটা গন্ধ এনে দেয়। চিন্তার কিছু নেই, এই সমস্যা এড়ানোরও উপায় আছে। এজন্য তোমাদের প্রতিদিন গোসলের সময় সাবান দিয়ে নাভি দ্রুত পরিষ্কার করলে তা যে কোন ধরনের অপ্রীতিকর গন্ধকে দূরীভূত করে। কিন্তু ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা যাবে না। মারমুখো পরিষ্কার ও অতিরিক্ত আর্দ্রতা ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করতে পারে।

এরপর নাভিতে চোখ পড়লে তোমাদের মনে রাখতে হবে সেখানে ভোজনোৎসবে মত্ত থাকা খুদে অণুজীবদের কথা।

অনাক্রম্যতন্ত্র সম্পর্কে চমকপ্রদ তথ্যগুলো

তুমি যখন আরাম করে বসে টেলিভিশন দেখছো তখন তোমার শরীর গঠনকারী ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কোষে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বহিরাগত আক্রমণকারী পূর্ণ দমে হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সামষ্টিকভাবে এদেরকে বলা হয় প্যাথোজেন বা রোগ উৎপাদক। এই আক্রমণকারী দলের মধ্যে একটি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া। এককোষী এই প্রাণটি খাদ্য ও বংশবৃদ্ধির জন্য বেঁচে থাকে। আরেকটি হচ্ছে প্রোটিস্ট (প্রোটিস্ট হচ্ছে সরল, ইউক্যারিওট, এককোষী আণুবীক্ষণিক জীব – যাদেরকে ছত্রাক, প্রাণী বা উদ্ভিদ কোন বিভাগেই ফেলা যায় না। যেমন এমিবা, ডায়াটম, প্যারামেসিয়াম)। অপর আরেক সদস্য হচ্ছে ভাইরাস। যার একগুচ্ছ কৌলিক তথ্য পোষক (Host) কোষের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং তার অভ্যন্তরে নিজ প্রতিলিপি সৃষ্টি করে। এবং আরেকটি হচ্ছে ছত্রাক, উদ্ভিদের এক ধরন।

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস হচ্ছে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে খারাপ ধরনের অনিষ্টকারক। বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়াগুলো শরীরে টক্সিন নিঃসৃত করে, যার ফলে রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন ই.কোলাই, এনথ্রাক্স, কালো প্লেগ। ভাইরাসের কারণে যেসব কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাতে হাম, ফ্লু ও সাধারণ ঠান্ডা সহ নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়।

আমাদের পরিবেশে যা কিছু আছে সবই এসব আণুবীক্ষণিক অনুপ্রবেশকারী দিয়ে পূর্ণ। এমনকি এরা আছে আমাদের শরীরে। শুধু পাকস্থলিতে এককভাবে যত ব্যাকটেরিয়া রয়েছে তা আমাদের শরীরে যত কোষ আছে তার চাইতেও সংখ্যায় বেশি। প্রতিদিনই মানুষের শরীর মিলিয়ন মিলিয়ন জীবাণুর মুখোমুখি হয়। যদিও দিনশেষে শরীরের টুকরো টুকরো খুদে খুদে সৈনিকরা এসব প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। বলিষ্ঠ প্রতিবন্ধক, বর্বর শক্তি, উন্নততর সমরক্ষেত্র বুদ্ধিমত্তার সংমিশ্রণের মাধ্যমে এই জয় অর্জিত হয়। আর এদেরকেই আমরা সামষ্টিকভাবে নাম দিয়েছি অনাক্রম্য ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম (Immune system)। এটি বিভিন্ন অঙ্গ, কলা ও কোষের সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের শরীরটাকে যদি এক দুর্গ হিসেবে কল্পনা করা হয় তবে তার সেনাবাহিনী রূপে আছে এই অনাক্রম্য ব্যবস্থা। যারা যে কোন ঘরোয়া ও বহিরাগত হুমকির বিরুদ্ধে শরীরকে সুরক্ষা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এর কাজ বিভিন্ন রোগ ও অনিষ্টকারক বহিরাগত জীবাণুর বিরুদ্ধে শরীরকে রক্ষা করা।

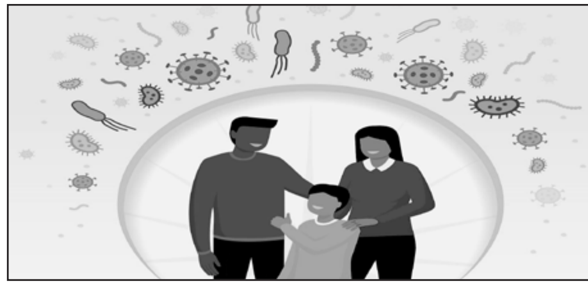

অনাক্রম্য ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্ময়কর কিছু তথ্য জেনে নেয়া যাক ।

১. নিরাময় কখনো কখনো যন্ত্রণাময়

হাঁচি, কাশি, গলা ব্যথা ও জ্বর হচ্ছে প্যাথোজেনকে বিতাড়িত করার বিভিন্ন পন্থা। এগুলো যতো বিরক্তিকারকই হোক না কেন প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয়। এই ধরনের রোগ উপসর্গগুলোর উপস্থিতি থেকে কখনো কখনো বোঝা যায় অনাক্রম্যতন্ত্র তার কাজটি করছে।

২. অনাক্রম্য সৈনিকরা আছে সর্বত্র

এক ফোঁটা রক্তে প্রায় ৩৭৫,০০০ শ্বেত রক্ত কণিকা (White Blood Cell) রয়েছে। সাদাটে অনাক্রম্য যোদ্ধা। আর আমাদের দৈহিক ওজনের শতকরা সাত ভাগ রক্ত দিয়ে গঠিত।

৩. অনাক্রম্যতা কর্জ নেয়া যায়

বুকের দুধে থাকা এন্টিবডি (রোগ প্রতিরোধক) রোগবালাই থেকে শিশুকে সাময়িক অনাক্রম্যতা দেয়, এমনকি তা দেয় শিশুর মাকেও। এটি বাল্য সংক্রমণ থেকে শিশুকে সুরক্ষা দেয়।

৪. এটি অভ্যন্তরীণ সমস্যাকেও মোকাবেলা করে

প্যাথোজেনের সাথে লড়াইয়ের পাশাপাশি, টি কোষগুলো (T-cell) শরীরের নিজস্ব ক্যান্সারাস কোষের সাথেও লড়াই করে। কিছু ক্যান্সার থেরাপি টি কোষ (T-cell) সংখ্যার উন্নতিসাধন করে। টি কোষ হলো এক ধরনের প্রতিরক্ষা কোষ, যা দেহে বহিরাগত আক্রমণাত্মক প্যাথোজেনকে চিহ্নিত ও ধ্বংস করতে পারে।

৫.পরিবর্তনের সাথে বিপত্তি

দুর্ভাগ্যবশত ফ্লু ও সাধারণ ঠান্ডার প্রতি অনাক্রম্যতা তৈরি করা যাবে না। কারণ ভাইরাসগুলোর সর্বদা পরিব্যক্তি হতে থাকে।

৬. অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া স্বাস্থ্যকর অনাক্রম্যতন্ত্রের এক চালিকাশক্তি

মানবদেহ ট্রিলিয়ন পরিমাণে ব্যাকটেরয়ার বসতি। আর গ্যাস্ট্রোইন্টেসটিনাল ট্রাক্টে এসব অণুজীব প্রায়ই উপকারী ভূমিকায় নিয়োজিত। উদাহরণস্বরপ, উপকারী ব্যাকটেরিয়া আমাদের এপিথেলিয়াল ও মিউকোসাল টিস্যুগুলোতে রোগাত্মক ব্যাকটেরিয়ার ভিত্তি গড়তে বাধা দেয়। আবার রোগাত্মক জীবাণু ও নিরীহ এন্টিজেনের মধ্যে উত্তমরুপে পার্থক্য করতে আমাদের অনাক্রম্যতন্ত্রকে প্রশিক্ষিত করতে সহায়তা করে। ▲গণস্বাস্থ্য

উনিশ শতকে বাংলার অপরাধ জগৎ

সিঁধেল চুরি থেকে আফিম চোরাচালান

মাহমুদুর রহমান

কোনো অঞ্চল যখন অন্য একটি দেশ বা জাতির উপনিবেশে পরিণত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই নতুন ধরনের শাসন কাঠামোর কারণে অঞ্চলটির বিকাশের ধারা বদলে যায়। পরবর্তী সময়ে ইতিহাস হিসেবে সাধারণত উপনিবেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়। সামাজিক অবস্থা, পরিবর্তনের কথাও উল্লিখিত হয়। কিন্তু আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে যে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ দেখা হয় – ক্ষেত্রবিশেষে অপরাধের নতুন ধারা সৃষ্টি হয়, তা ইতিহাসের মূল ধারায় আলোচিত হয় না। কিন্তু আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধরনের অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি সামাজিক কাঠামোর বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ভারত যে সময়ে ইংরেজ উপনিবেশে পরিণত হয় সে সময়ে এ অঞ্চলেও বিভিন্ন প্রকার অপরাধ বহুকাল ধরেই প্রচলিত ছিল। ঔপনিবেশিক ভারতের এককালে রাজধানী কলকাতা হয়ে উঠেছিল নানা ধরনের নিত্যনতুন অপরাধের লীলাভূমি। ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অপরাধ, দুর্ধষ অপরাধী আর তাদের পেছনে ছোটা পুলিশের অভিজ্ঞতা বর্তমান সময়ের কোনো গোয়েন্দা গল্প থেকে কম রোমাঞ্চকর নয়।

সাধারণ চুরি দিয়েই শুরু করা যাক। মাটির ঘরের দেয়াল বা মেঝে খোঁড়ার এক অতি সাধারণ কিন্তু কার্যকরী যন্ত্র সিঁধকাটি। ভারতের বিশেষত বাংলার চোরেরা এই সিঁধকাটি দিয়েই অতি অল্প সময়ে মাটির মেঝে কিংবা দেয়াল খুঁড়ে গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে যেতে পারত। কৌশল, অনুশীলন তাদের এমনই দক্ষ করে তুলেছিল যে মাত্র দু-তিনজনে স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি ঘরে সিঁধ কেটে চুরি করে আসতে পারত। সেকালের একজন পাকা সিঁধেল মনিরুদ্দিনের মতো এমনও চোর ছিল যারা আধা ঘণ্টার মধ্যে ঘরের বাইরে থেকে সিঁধ কাঁটা শুরু করে ঘরের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারত। মাটি নয় কেবল, ইটের দেয়ালের মধ্যেও রন্ধ্র তৈরি করতে পারত তারা। 'নিশি রাতে বাঁশি তার সিঁধকাটি হয়ে/ চুপি চুপি ঘরে এসে বাজে রয়ে রয়ে' – মান্না দের কণ্ঠে এ গান অনেকেরই পরিচিত। কৃষ্ণের বাঁশি কেমন করে সবার অগোচরে রাধাকে উদ্বেল করত, সে কথা এই গানে উল্লিখিত। সিঁধকাটির সঙ্গে তুলনা করার কারণ হলো সিঁধকাটি দ্বারাও এ রকমই সবার অগোচরে চোরেরা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করত।

সিঁধেল চোরদের পাশাপাশি উনিশ শতকের কলকাতায় আরো বিভিন্ন ধরনের চোর বিচরণ করত। পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে বিশের বেশি প্রকারভেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার চোরদের মধ্যে কিছু শ্রেণীবিভাগও ছিল। যারা যে ধরনের কাজ করত সে অনুসারে নাম, যেমন ফুট (চুরি করে দ্রুত পালানো চোর, ফুটে যাওয়া থেকে এই নাম), ফিতের কর্ম (দরজার খিল বা তালা খোলার জন্য এরা ফিতা ব্যবহার করত)। সময়ভেদে চুরি করার রেওয়াজ ছিল। ভোরের চোররা 'ভোরে মারি', দিনের চোরেরা 'দিনে মারি', সন্ধ্যার চোরেরা 'সন্ধ্যা মারি' প্রভৃতি নাম ব্যবহার করত। কোনো কোনো চোর কেবল ইউরোপীয়দের বাড়িতেই চুরি করত। ধোপদুরস্ত পোশাক পরে তারা এসব বাড়িতে ঢুকে পড়ত, কখনো বাড়ির আশপাশের গাছ বেয়ে ভেতরে ঢুকে চুরি করে নিত। চোরদের মধ্যে কিছু উঁচু-নিচু ভেদ ছিল, যেমন ছিঁচকে চোররা সিঁধেলদের চেয়ে নিম্নমানের বলে মনে করা হতো।

বাংলার বিভিন্ন অপরাধীদের মধ্যে এ চোরেরা সম্ভবত অন্যদের তুলনায় বিশেষভাবে নিজেদের প্রস্তুত করত। ছিনতাই, জালিয়াতি, চোরাচালানির চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই চুরি একটি প্রাচীন পেশা (অবশ্যই অপরাধ)। চৌর্যবৃত্তি অত্যন্ত পুরনো এবং যদিও এটি ঔপনিবেশিক আমলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোনো অপরাধ নয়, কিন্তু বস্তুত উনিশ শতকে চুরির ধরন বদলে গিয়েছিল। চোরেরা হয়ে উঠেছিল কৌশলী, বেপরোয়া ও দক্ষ। সংঘবদ্ধভাবে একেকটি চক্র এ চুরি পরিচালনা করত। যেখানে কারো কাজ ছিল কেবলই রেকি করে কোনো বাড়ি বা ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করা। কখনো একটি দলের একজন সদস্য একটি ধনী গৃহস্থের ভৃত্য হিসেবে সেই ঘরে প্রবেশ করত এবং কোন জায়গায় কোন সম্পদ লুকানো তা নিজের দলের কাছে পৌঁছে দেয়ার পর চুরি সংঘটিত হতো। যেমন কলকাতার জনৈক রমাকান্ত মুনশীর বাড়িতে কর্মরত বনমালীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার পর সে গোবিন্দরাম নামে এক সিঁধেলের সঙ্গে মিলে রমাকান্তর বাড়িতে চুরি করেছিল।

এমন অনেক চুরির বর্ণনা পাওয়া যাবে উনিশ শতকের কলকাতার পুলিশ রিপোর্টে। রিপোর্ট অনুসারে ১৮৫১-৭১ সালের মধ্যে কলকাতায় খুন কমে গেলেও চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বেড়ে গিয়েছিল। এ সময়ে চোরেরা বেপরোয়া হয়ে পড়ে এবং পকেটমার, ছিনতাই বেড়ে যায়। 'গাঁটকাটা' শব্দটির সঙ্গে অনেকের পরিচয় না থাকলেও সাধারণত একে আমরা এ যুগে চলতি বাংলায় পকেট মারিং বলি। মূলত সেকালের কলকাতার বেশির ভাগ লোক ধুতি পরিধান করত এবং কোমরের কাছে একটি সরু বস্ত্রখণ্ড বাঁধত, যার সঙ্গে ছোট একটি টাকার থলে সংযুক্ত থাকত। কলকাতার চোরেরা এ কাপড়ের বেল্টের বন্ধন কাটত। গিঁট বা গাঁট কেটে চুরি/ছিনতাই করার কারণে এদের নাম হয়েছিল 'গাঁট কাটার দল'। পরবর্তী সময়ে কলকাতার শিক্ষিত শ্রেণী ইউরোপীয় পোশাক পরা শুরু করলে পকেট কাটা, পকেট মারা শুরু হয়। গাঁট কাটা থেকে পকেটো কাটা – ঔপনিবেশিক শাসনে সামাজিক পরিবর্তনের সাক্ষী। সবাই যে টাকা চুরি করত এমন নয়। ঘড়ি, আংটি এমনকি রুমালও চুরি

হতো। রুমাল চুরির এ ঘটনা অবশ্য ইংল্যান্ডেও ছিল। ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট' উপন্যাসে এর চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়।

জনৈক হাফিজ সাহেবের (ছদ্মনাম) স্ত্রী একদিন সকালে মর্নিং ওয়াকে গেলেন। ফজরের পরপর নিরিবিলি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সামনে একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে দেখলেন এবং বৃদ্ধ তাকে সালাম দিলে তিনিও জবাব দিলেন। তাদের মধ্যে কিছু কথোপকথন হলো। কিছুক্ষণ পর ভদ্রমহিলা ওই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে নিজের বাসায় নিয়ে এসে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার প্রভৃতি নিজের হাতে দিয়ে দিলেন। প্রায় সম্মোহিত অবস্থায় করা নিজের এ কাজের কোনো ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেননি। বছর খানেক আগে আমারই এক প্রতিবেশীর এ ঘটনার মতো কলকাতার পথেঘাটে অহরহ এ ভিন্ন ধরনের ছিনতাই/লুট হতো। 'উদাসী ফকির' নামে পরিচিত হওয়া এ দলটির মধ্যে প্রধান ব্যক্তি তার 'টার্গেট'কে লক্ষ্য করে পথের মধ্যেই সামনে গিয়ে দাঁড়াত। ভারতে স্বাভাবিকভাবেই ফকির-সন্ন্যাসীদের সম্মান দেয়া এবং তাদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসের কারণে এসব ভণ্ড সন্ন্যাসী পথচারীদের সহজেই প্রলুব্ধ করত। ভবিষ্যৎ কথন বা কোনো বিপদের নাম করে তাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করা ছিল এদের প্রথম কাজ। পরে দলের অন্য দু-একজন সদস্য এসে 'বাবা/গুরু, আপনার দয়ায় আমার সংকট কেটে গিয়েছে' জাতীয় কথা বলে 'টার্গেট' ব্যক্তির মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করা হতো।

উনিশ শতকের কলকাতায় শিক্ষার প্রসারের কারণে মফস্বল থেকে সেখানে কিশোর, তরুণদের আগমন ঘটত। এদের বলির পাঁঠা বানিয়ে এ ধরনের উদাসী ফকিররা নিজেদের ডেরায় কিংবা নিরিবিলি স্থানে নিয়ে সর্বস্ব লুট করত। ঔপনিবেশিক কলকাতার অপরাধের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে সেকালেও দুপুরবেলা পুরুষের অনুপস্থিতিতে পণ্য বিক্রি কিংবা অন্য অজুহাতে কিছু চোর অন্দরে ঢুকে নারীদের সম্মোহিত করে অলংকার, অর্থ প্রভৃতি লুট করত। এ চোরেরা কতটা বেপরোয়া ছিল তা একটি চুরির উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে। রমজান চোর একদিন এক বাড়িতে ঢুকে গৃহকর্ত্রীর চেতনা লুপ্ত করে তার এক হাতের বালা নিতে না নিতে তিনি সচেতন হয়ে উঠলে সে পালিয়ে যায়। কিন্তু পরে পরিবারের কর্তা পুলিশে রিপোর্ট করার খবর রমজানের কানে গেলে সে পুলিশের জমাদারের পোশাক পরে এসে বালার নমুনা হিসেবে অন্য হাতের বালাটি হস্তগত করে।

কর্তাকে মূলত বুদ্ধির বলে বোকা বানিয়েছিল রমজান। কিন্তু নারীদের অচেতন করার কৌশল কী? সুমন্ত ব্যানার্জি বলেন, ফাঁপা বাঁশের কঞ্চির মধ্যে এক ধরনের নেশাদ্রব্য রেখে সময় বুঝে তা ফোঁকা হয়। এসব ক্ষেত্রে সম্মোহন কিংবা চেতনা লুপ্ত করতে ঠিক কী ব্যবহার করা হতো তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। তবে মনোজ বসু তার বিখ্যাত উপন্যাস 'নিশিকুটুম্ব'তে 'নিদালী বিড়ি'র উল্লেখ করেছেন। সাধারণত সিঁধেলরা সিঁধ কেটে কোনো নারীর অঙ্গ থেকে অলংকার খোলার আগে এই বিড়ির ধোঁয়া তাদের নাকেমুখে ছাড়ত। অর্থাৎ কোনো না কোনো প্রকার নেশার বস্তু এতে মিলিত থাকত।

নেশার বস্তুই কেবল নয়, রীতিমতো নানা বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করেও লুট করা হতো। যেমন আজকের দিনে আমরা যে 'অজ্ঞান/মলম পার্টি'র নাম শুনি, এদেরও পূর্বসূরি ওই উনিশ শতকেই ছিল। সেকালেও নদীপথ কিংবা স্থলপথে যে ব্যবসায়ী বা পথিকরা চলাচল করত তাদের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার মতো অপরাধীর অভাব ছিল না। এরা সাধারণত পথিক, ভ্রামণিক বা দলের সঙ্গে প্রথমে নিজেকে পরিচিত করত। সুযোগ বুঝে তাদের খাবার বা পানীয়তে বিষাক্ত দ্রব্য মিশিয়ে দিয়ে অজ্ঞান করার মাধ্যমে সম্পদ লুট করত। অজ্ঞান করার ক্ষেত্রে এদের প্রধান উপাদান ছিল ধুতুরা। উনিশ শতকে ইসলাম নামে একজনের হদিস পাওয়া যায়, যে কিনা এই অজ্ঞান করার বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। সাতজনের একটি দলের প্রধান এ ব্যক্তি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডকে নিজেদের অপকর্মের লীলভূমি করে তুলেছিল। বহুদিন এ পথে চলাচলকারীদের লুট করার পর অবশেষে সে ধরা পড়ে ১০ বছরের নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল।

চোর, ছিনতাইকারী থেকে আরম্ভ করে সেকালের কলকাতায় আরেক শ্রেণীর অপরাধীর আবির্ভাব কিংবা বলা যায় সৃষ্টিই হয়েছিল। এদের মধ্যে যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তা হলো দলের মধ্যে কোনো ধর্মীয় বিভেদ ছিল না। একজন মুসলিমের অধীনে হিন্দুরা নির্দ্বিধায় কাজ করত। কিংবা হিন্দু নেতা মুসলিম কর্মী নিতে কখনো দ্বিধা করত না। চোর, অজ্ঞানকারী লুটেরারা মূলত প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ। এদের কাজের ভিত্তি ছিল অভিজ্ঞতা আর অনুশীলন এবং তৎকালীন পুলিশ বিভাগের মতে, 'অপরাধ করার পদ্ধতিকে এরা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল।' কিন্তু সময়ের সঙ্গে কলকাতা তথা বাংলায় শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হলে অপরাধের ধরন বদলে যায়। পরিশ্রমের সঙ্গে বুদ্ধি খরচ করতে শুরু করল একশ্রেণীর অপরাধী দল। এদের সহজ কথায় প্রতারক, জালিয়াত বলা চলে। জাতিয়াতির প্রকারের বিশ্লেষণ না করে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

একদা ত্রিপুরার তরুণ মহারাজ লক্ষ করলেন তিনি দেনায় ডুবন্ত, নগদ অর্থ ঋণ করা প্রয়োজন। সহকারী শশিভূষণ বসুকে তিনি কলকাতায় প্রেরণ করলেন। মেছুয়াবাজারে একটি ঘর ঠিক করে সেখানে তিনি একজনের সঙ্গে পরিচিত হলেন, যিনি জানালেন তিনি মূলত একজন মহারাজকে চেনেন যিনি কিনা অর্থ দিতে সক্ষম। অকুস্থলে পৌঁছে শশিভূষণ লক্ষ্য করলেন মহারাজ জুয়ায় হেরে হাজার টাকার বান্ডিল অবলীলায় দান করলেন। মহারাজকে নিজের সংকটের কথা জানালে তিনি বললেন, অবশ্যই তিনি অর্থ দান করবেন, পাশাপাশি ব্যবসার জন্য আলাদা অর্থও দান করবেন। কিন্তু সেখান থেকে ৫ শতাংশ তাকে প্রদান করতে হবে। নির্দিষ্ট দিন মহারাজকে 'কমিশন' প্রদানের পর শশিভূষণ যখন মহারাজের কাছ থেকে মূল অর্থ গ্রহণ করবেন, অন্দর থেকে খবর এলো মহারাজের শিশুপুত্র আহত। তিনি দ্রুত গমন করলেন এবং শশিভূষণকে বললেন তিনি যেখানে পাটের ব্যবসা করতে চান সেই অঞ্চলে টাকা প্রেরণ করা হবে।

শশিভূষণের সে কাঙ্ক্ষিত অর্থ কোনোদিনও আসেনি এবং তিনি যখন কলকাতায় সেই বাড়ির সম্মুখে পুনরায় পৌঁছেন, জানতে পারেন বাড়িটি কিছুদিনের জন্য ভাড়া নেয়া হয়েছিল। মূলত ঔপনিবেশিক কলকাতায় এ রকম অনেক মহারাজের সৃষ্টি হয়েছিল, যারা অসামান্য দক্ষতায় রীতিমতো একটি নাটকের সেট তৈরি করে নাটক মঞ্চস্থ করত, যা শশিভূষণের মতো শিক্ষিত মানুষের পক্ষেও বোঝা অসম্ভব হতো। পরবর্তী সময়ে শশিভূষণ যখন পুলিশের

কাছে অভিযোগ করেন, দলের প্রত্যেকে একে একে ধরা পড়ে, যাদের মধ্যে একজন লক্ষ্ণৌয়ের, একজন কলকাতার মানিকতলার অধিবাসী এবং মূলত এরাই মূল হোতা। রাজা হিসেবে যাকে সাজানো হয়েছিল সে নেহাত একটি পুতুল। শশিভূষণ আরো জেনে অবাক হন যে জুয়ায় হেরে রাজা সাহেবের দান করা হাজার টাকার বান্ডিলের কেবল ওপরের নোটটিই হাজার টাকার, ভেতরে সব সাদা কাগজ। কিন্তু পুলিশ আরো অবাক হয় যখন জানতে পারে যে ওই একটি নোটও নকল!

মুদ্রা জালিয়াতিও নতুন কিছু নয় এবং ঔপনিবেশিক বাংলায় এ চর্চা ছিল আরো বিস্তৃত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ক্ষমতা গ্রহণ করে তখন সম্রাট শাহ আলমের নামে থাকা 'সিক্কা' চালু ছিল। ১২ গ্রাম ওজনের এ রুপার টাকা বেনারস, ফররুখাবাদ ও বোম্বে থেকে তৈরি হতো। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে শোনা যায়, পুরনো মুদ্রার উচ্চমূল্যমানের কারণে কোম্পানির চালু করা নতুন মুদ্রার পাশ ঘষে পুরনো বলে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি একটি নতুন টাঁকশাল স্থাপন করে – যা ৭ ঘণ্টায় ৩ লাখ সিক্কা তৈরি করতে পারত। মেজর ফোর্বসের তৈরি এ আধুনিক যন্ত্র কিছুকালের জন্য কোম্পানিকে স্বস্তি দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে কোম্পানি কাগুজে মুদ্রাও চালু করে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই মুদ্রা জালিয়াতের অভাব হয়নি। সিক্কা বা ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রে পোদ্দার, কামার, অলংকারশিল্পীরা জালিয়াতি করত। তবে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

রসায়নবিদ্যা ও প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে শ্যামাচরণ এবং তার তিন-চারজন সাগরেদ মিলে 'রানীর মুদ্রা' জালিয়াতি করে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে ব্রিটিশ মুদ্রা কলকাতার বাজারে মুখ থুবড়ে পড়ার মতো অবস্থা হয়। এ শ্যামাচরণের পেছনে গোয়েন্দা বিভাগ উঠেপড়ে লেগেছিল। অফিসারদের মধ্যে একজন ছিলেন 'দারোগার দপ্তর' লেখক প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি এ জালিয়াতের পেছনে ব্যয় করা তার শ্রম ও অভিযানের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। প্রিয়নাথের মতে, শ্যামাচরণ একজন দক্ষ মুদ্রা জালিয়াত, পাকা অভিনেতা ও অসাধারণ দলনেতা। কেননা প্রথমবার প্রিয়নাথ যখন চোরবাগানের ডেরায় শ্যামাচরণের মুদ্রা তৈরির ব্যবস্থা নিজের চোখে দেখেন (অবশ্যই গোপনে), পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে শূন্য ডেরা ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময়ে প্রিয়নাথ যখন আবার এ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে হাতেনাতে ধরতে যান, যে বাড়িটিকে প্রিয়নাথ লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, সেখানে এক মরণাপন্ন ব্যক্তির শেষ মুহূর্ত উপস্থিত দেখতে পান। সেখানে একজন বিখ্যাত ডাক্তারের সঙ্গেও পরিচয় হয়, যিনি প্রিয়নাথকে একটি ভিজিটিং কার্ড দেন। মরণাপন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হলে সবাই তাকে নিয়ে শ্মশানে গেলে প্রিয়নাথ সেই শেষ শয্যার নিচে একটি গুপ্ত কুঠুরির খুঁজে পান, যেখানে মুদ্রা নকল করার যন্ত্রপাতির কিছু অংশও ছিল। কিন্তু নিমতলা বা কালীঘাটে খবর নিয়ে জানতে পারেন নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে কোনো শবদাহ হয়নি এবং সেই বিখ্যাত ডাক্তার বলে পরিচয় দেয়া ব্যক্তি মূলত ডাক্তারের কার্ডটি হাতিয়ে প্রিয়নাথকে দেখিয়েছিল।

এসব ঘটনা থেকে সেকালের জালিয়াতদের দক্ষতা ও মরিয়াপনার কথা বোঝা যায়। তারা সরাসরি পুলিশকে বোকা বানাতেও কসুর করত না। যদিও প্রায় চার মাস পর প্রিয়নাথ দারোগা এ শ্যামাচরণকে ধরেছিলেন, কিন্তু এমন হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন আরেক দারোগা বাকাউল্লাহ। হরিদাস নামের জালিয়াতকে গ্রেফতার করার পর সেই জালিয়াত নিজেকে কৃষ্ণদাস বলে পরিচয় দিয়েছিল। নদীয়ায় এ গ্রেফতারের পর তৎক্ষণাৎ পুলিশ স্টেশনে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলে ওই ব্যক্তির ঘরেই রাতের খাবার খেতে হয়েছিল বাকাউল্লাহর। দু'জন সেপাইসহ তার খাবারের সঙ্গে ধুতুরা মিশিয়ে দেয়া হয়। মূলত এ জালিয়াতরা অজ্ঞান করার ক্ষেত্রে কী পরিমাণ ধুতুরা ব্যবহার করতে হয় তা জানত বলে বাকাউল্লাহ বেঁচে গিয়েছিলেন। হরিদাস যদি চোরা কারবারি হতো, তাহলে হয়তো বাঁচতেন না। সেকালের 'অজ্ঞান পার্টি'র অনেকে এ পরিমাণ সম্বন্ধে না জানার কারণে তাদের অনেক 'শিকার' মৃত্যুবরণ করত।

উনিশ শতকের শেষের দিকে চোরাকারবার ফুলেফেঁপে ওঠে। মূলত ওই সময়ে নীল চাষের পাশাপাশি আফিমের বাজার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে নদীপথে চোরাচালান বাড়ে। অবশ্য নানা প্রকার চোরাচালান আরো আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। বিশেষত দাস ব্যবসার কারণে। এতক্ষণ যদিও কলকাতাভিত্তিক অপরাধের কথাই বলা হয়েছে, তবে এ পর্যায়ে পূর্ব বাংলাও যুক্ত হবে। চোরাচালানের ক্ষেত্রে হুগলি থেকে বঙ্গোপসাগর হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত অপরাধ বিস্তৃত হয়েছিল। মূলত তখনো মগ জলদস্যুরা চট্টগ্রামসহ বর্তমান বাংলাদেশের সন্দ্বীপ, বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) ও সুন্দরবন অঞ্চলে জলদস্যুতা করত। এরা যুক্ত হয়েছিল দাস ব্যবসার সঙ্গে। এসব উপকূলীয় অঞ্চল থেকে কিশোর-কিশোরী, যুবক ও নারীদের অপহরণ করা হতো। কোম্পানি শাসনের শুরুতেই দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ হয়নি। পরবর্তী সময়ে সে রকম নিষেধাজ্ঞা এলেও কিশোরী-তরুণীদের অপহরণ করে কলকাতায় বিক্রি করা অন্যতম লাভজনক ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা তখন কলকাতায় 'বাবু কালচার' বেড়ে উঠছিল এবং বাইজি, পতিতা ও মাদক ছিল তাদের অন্যতম বিলাস।

কলকাতার উঠতি ধনীদের এসব বিলাস সরবরাহ করার জন্য আফিম, মদ চোরাচালানের পরিমাণ বেড়েছিল। পাশাপাশি আরেক শ্রেণীর ধাপ্পাবাজ গড়ে উঠেছিল। 'কাপ্তেন' বলে পরিচিত এসব লোকের কাজ ছিল নব্য ধনী বা এ প্রকারের লোকদের ধরে নির্দিষ্ট কোনো বাইজিখানায় নিয়ে যাওয়া। অতঃপর মফস্বলের কোনো জমিদার বা ব্যবসায়ীর নির্বিচার খরচের মধ্য থেকে এদের পকেট ভারী হয়ে উঠত। এদের কেউ কেউ আবার নোট কিংবা স্ট্যাম্প জালিয়াতির সঙ্গেও যুক্ত ছিল বলে জানা যায়। চোরাচালান এদের কারো কারো মূল ব্যবসাও ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ সময়ের চোরাচালানের মধ্যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ জায়গা করে নিয়েছিল। বাবুদের বিলাসের আরেকদিকে শোষিত হওয়া মানুষ যখন বিদ্রোহের মুখে, তখন অস্ত্র হয়ে উঠেছিল অন্যতম পণ্য। ফলে সেসব জোগানের পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায় চোরাকারবার। অবশ্য সে অস্ত্র কেবল স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের হাতেই যায়নি, অন্যান্য অপরাধীর হাতেও পৌঁছেছিল। যেমন এখনো পৌঁছে থাকে। মূলত ঔপনিবেশিক আমলের সেসব অপরাধের নানা বিবর্তিত রূপ এখনো দক্ষিণ এশিয়ার সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

সৌজন্যে : বণিক বার্তা, ২০ আগস্ট ২০২১

মূত্রাশয় প্রদাহ : কীভাবে ব্যাকটেরিয়া মূত্রাশয়ে প্রবেশ করে

জান্নাতুল ফিজা
প্রাক্তন শিক্ষার্থী, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

আমেরিকার বিখ্যাত পত্রিকা *Scientific American*-তে Gm.B.Mj (S.E.Golds) নামক একজন লেখক মূত্রাশয় প্রদাহ (Cystitis) নিয়ে চমৎকার একটি লেখা লিখেছিলেন ২০১২ সালে। প্রতিবেদনটির ভাবার্থ নিচে দেওয়া হলো :

গত এক বছরে এটি আরো বেশি স্পষ্ট হয়েছে যে আমি আসলে বারবার মূত্রাশয় প্রদাহ (Cystitis)-এ আক্রান্ত হই। মূত্রাশয় প্রদাহ (Cystitis) হলো ম্যাট্রিক্সে প্রবেশের মতো। আমি প্রথম আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে জানতাম না এটি কী ধরনের রোগ! এটি বই, ছায়াছবি বা শ্রেণিকক্ষ পাঠগুলিতে পড়ানো হয় নি (বিশেষত আমার স্কুল এ যৌন স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত কোনও পাঠ দেয়নি) এবং কেউ এটিকে অসুস্থতার সম্ভাবনা হিসাবেও পরামর্শ দেয়নি।

আমার এই সমস্যা হয়েছিল এবং আমি জানতে পেরেছিলাম যে বেশিরভাগ মহিলা তাদের জীবনে শুধু একবারই এটিতে আক্রান্ত হয় এমন নয়। বছরে প্রায় তিনবার এতে আক্রান্ত হওয়া দৃশ্যত স্বাভাবিক।

মূত্রাশয় প্রদাহ (Cystitis) হলো ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা মূত্রনালি বা মূত্রাশয়ের সংক্রমণ। প্রধান লক্ষণগুলি হলো প্রস্রাবের সময় প্রস্রাব করার একটি মরিয়া আকাঙ্ক্ষা – যা জ্বলন্ত এসিডের মতো অনুভূত হয়! যদি খুব বেশি সময়ের জন্য হয়ে থাকে অবশেষে আপনি রক্ত প্রস্রাব করা শুরু করেন যা প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ আতঙ্কজনক। এই রোগটি তখন হয় যখন বাইরের পরিবেশ থেকে ব্যাকটেরিয়া মূত্রনালিতে প্রবেশ করে (ছোট পাইপে যেখানে প্রস্রাব বের হয়)। পুরুষদের তুলনায় নারীদের অনেক ছোট মূত্রনালি থাকে। তাই তাদের ক্ষেত্রে প্রায়শই এমনটি ঘটতে পারে।

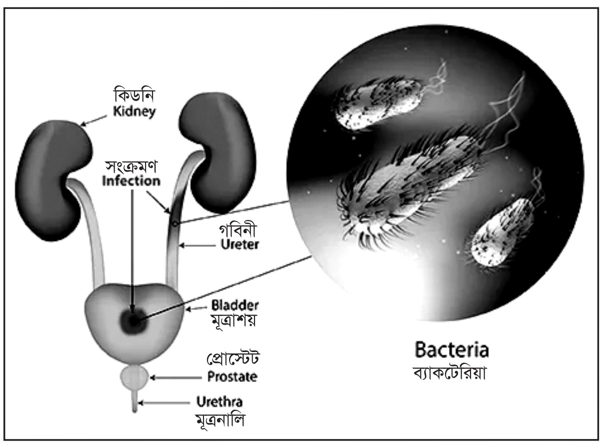

পুরুষ মূত্রাশয়ের প্রদাহের চিত্র

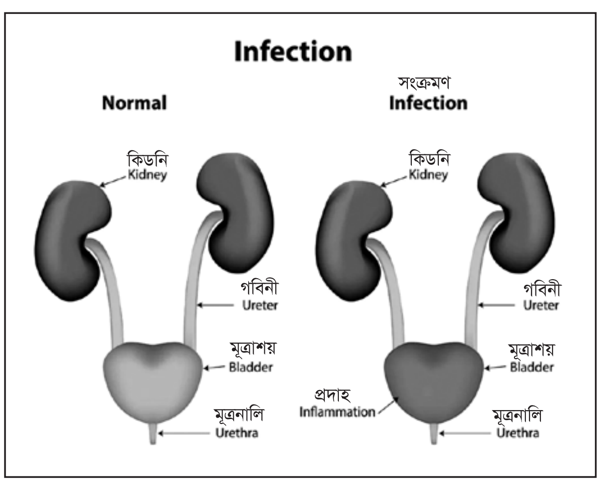

নারীর মূত্রাশয়ের প্রদাহের চিত্র

মূত্রাশয় প্রদাহের আক্রমণে কী ঘটে বা কেন কেউ অন্যের তুলনায় অধিক হারে আক্রান্ত হয় সে বিষয়ে কেউই পুরোপুরি নিশ্চিত না। প্রমাণ হিসেবে যৌন সম্পর্ক, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং ডিহাইড্রেশনের বা পানিশূন্যতার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক কারণ হিসেবে দেখানো হয়। মূত্রাশয় প্রদাহ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা নেই। এই কারণে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ফলে ক্রানবেরি, ফলের রস, ঢিলেঢালা অন্তর্বাস পরিধান এবং প্রচুর পরিমাণে জল পান করার পরামর্শ দেওয়া ছাড়া তেমন কিছুই ঘটে না। (আমার তৃতীয় বার আক্রমণ হওয়া পর্যন্ত আমাকে কার্যকর এন্টি-সিস্টাইটিস গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল)। তাই আমি সবসময় এ বিষয়ে নতুন গবেষণাপত্রে আগ্রহী। বিশেষত এই মুহূর্তে প্লস প্যাথোজেনসে একটি আকর্ষণীয় গবেষণাপত্র রয়েছে (রেফারেন্সে উল্লেখিত) যেটাতে মূত্রাশয় প্রদাহজনিত ব্যাকটেরিয়ার জীবনচক্রের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

মূত্রাশয় প্রদাহ (Cystitis)-এর সবচেয়ে সাধারণ ব্যাকটেরিয়া হলো ই কোলাই, (E. Coli)। কারণ এটি শরীরে প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাই শরীরে সাধারণত বেশ কার্যকরী সহজাত প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে – যা ব্যাকটেরিয়াকে টিস্যু বা রক্তপ্রবাহের কাছাকাছি কোথাও যেতে দেয় না।

কিন্তু মূত্রাশয় প্রদাহে কিছু কারণে এই প্রতিক্রিয়াটি কার্যকর হয় না। এটি কোনও মহিলার জেনেটিক বা বংশগত কারণ হতে পারে, অন্যের জন্য স্পষ্ট শারীরিক কারণ থাকতে পারে (যেমন

অদ্ভুতভাবে মূত্রনালি তৈরি হওয়া বা কিডনির সমস্যা)। যেখানে ব্যাকটেরিয়া জায়গা করে নিয়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

ব্যাকটেরিয়ার প্রথম চ্যালেঞ্জ মূত্রনালিতে পৌঁছানো! আগেই বলেছি মহিলাদের মূত্রাশয় তুলনামূলক মোটামুটি সংক্ষিপ্ত। তবে এটি শ্বেত রক্তকণিকা (White Blood Cell - WBC) এবং এটির মধ্য দিয়ে নিয়মিত জলপ্রবাহের দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। প্যাথোজেনিক (রোগ জীবাণু বাহক) ব্যাকটেরিয়াগুলির বিস্তৃত আঠালো অণু এবং অন্যান্য এজেন্ট রয়েছে।

ব্লব : Blob

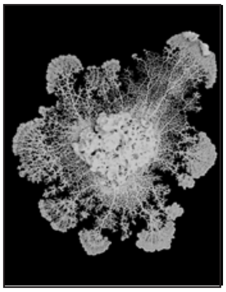

ব্লব এমন এক বস্তু যা যখন কোনো পৃষ্ঠের সাথে আবদ্ধ হয় তখন জীবাণুটি একটি ভাসমান ব্লব থেকে একটি পৃষ্ঠের সাথে হামাগুড়ি দিতে সক্ষম একটি ফোটাতে পরিণত হয় (ব্লব হচ্ছে পুরু তরল বা সান্দ্র পদার্থ)। মূত্রাশয় প্রদাহ (Cystitis)-এর জন্য দায়ী বিশেষ ই. কোলাই-এ মূত্রনালিতে টিস্যু বাঁধতে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য অনেক অণু রয়েছে।

বিজ্ঞানীদের কাছে এটি এখনও পরিষ্কার নয় কোনগুলি মানুষের মধ্যে সংক্রমণের সাথে সরাসরি যুক্ত; যেহেতু গবেষণাটি মূলত ইঁদুরের উপরেই করা হয়েছে। ই. কোলাই প্রস্রাবকে আটকে রাখতে পারে। প্রস্রাবের প্রবাহের ভিড়কে এটি টিস্যুতে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে। মূত্রাশয়ে ই. কোলাই প্রবেশ করার পর তাদের নষ্ট করার জন্য পোষকের (Host) কোষগুলো তাদেরকে কোষের ভেতরে নিয়ে নেয়। বেশিরভাগ ব্যাকটেরিয়া এভাবে মারা যাবে অন্যরা কোষগুলোর ভিতরে সামান্য বায়োফিল্মের মত গুচ্ছ করতে পারে। (বায়োফিল্ম হলো এমন সংশ্লেষের মিশ্রণ যা কিনা একে অপরের সাথে লেগে থাকে)।

এই ছোট ব্যাকটেরিয়া পুঞ্জ চারপাশে আমিষ ও শর্করার এক আর্দ্র জগাখিচুড়ি দিয়ে বেষ্টিত থাকে। যা ব্যাক্টেরিয়াকে কোষের হত্যা প্রচেষ্টা থেকে রক্ষা করে। এখান থেকেই গল্পটি ভৌতিক কল্পকাহিনিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। মনে রাখবেন এটি মানব মূত্রাশয়ের ভিতরে ঘটছে। বায়োফিল্মটি তার যে কোষে বাড়ছে সেখানকার নিউক্লিয়াসকে ঘিরে নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করে এবং সাইটোপ্লাজমকে পূরণ করে। এটি এত বড় হয়ে যায় যে কোষটি মূত্রাশয়ের জায়গাতে প্রকৃতপক্ষে ভিতরের দিকে প্রস্ফুটিত হতে শুরু করে। ছোট ব্যাকটেরিয়াল ফিলামেন্টগুলি (তন্তু) বের করা শুরু করে যা বাইরের দিকে প্রসারিত হয়!

তারপর তারা চারপাশের কোষগুলির দিকে অগ্রসর হয় এবং সেগুলিতে সংক্রমণও শুরু করে। জীবাণুগুলি কেবল মূত্রাশয়ের কোষগুলিকে দখল করতে শুরু করে না; তারা সাইটোকাইনস (ছোট প্রতিরোধ ব্যবস্থার সংকেত অণু)-এর উৎপাদনকে দমন করে। ই. কোলাই আবার আইডিওর উৎপাদন বাড়িয়ে দেয় – যা দেহকে সংকেত পাঠায় যে শরীরে যথেষ্ট সাইটোকাইন রয়েছে; বাড়তি সাইটোকাইন তৈরির দরকার নেই।

তাছাড়া অনাক্রম্য পদ্ধতি বা ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে যোগাযোগের চ্যানেলগুলি ভেঙে দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে। মূত্রাশয়ের বাইরের টিস্যু স্তরটির সমস্যাটি হলো এটি ক্রমাগত এক্সফোলিয়েশনের (এক্সফোলিয়েশন হলো ত্বকের বাইরের পৃষ্ঠের সবচেয়ে প্রাচীন মৃত ত্বকের কোষগুলি অপসারণের সাথে জড়িত) মাধ্যমে প্রবাহিত হয় – যা ব্যাকটেরিয়া উপনিবেশের জন্য অনিরাপদ।

দীর্ঘস্থায়ী বেঁচে থাকার জন্য, ব্যাকটেরিয়াগুলি অন্তর্নিহিত বেসাল এপিথেলিয়ামে (পিরামিডের মত কোষ) ডুবে যেতে পারে। ব্যাকটেরিয়াগুলি অ্যাক্টিন অণু গ্লাবুইলার সুরক্ষামূলক নেটওয়ার্কের সাথে নিজেকে ঘিরে রাখতে পারে। এই ব্যাকটেরিয়া এন্টিবায়োটিক আক্রমণ প্রতিরোধী এবং বেশ কয়েক মাস ধরে কেবল সুপ্ত থাকতে পারে। যে পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে এটি এভাবে থাকে এর পুনরাবৃত্তি মূত্রাশয় প্রদাহ (Cystitis) সূচনা করে তা এখনও একটি রহস্য।

আক্রান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে পুনরাবৃত্তি মূত্রাশয় প্রদাহ (Cystitis)-এর অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো সংক্রমণের প্রতিটি ধাপে টিস্যুগুলিকে স্ফীত করে দেয়! তখন নিরাময়ের পরেও আবার সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

হাঁপানি, ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী রোগের উপসর্গগুলির মতো এটিও নিরাময় হয় না। এটি এমন কিছু যা নিয়ে বাঁচতে হবে। ইন্টারনেটে পরামর্শের অনেক উৎস রয়েছে, যার মধ্যে সবগুলিই একই ধরনের জিনিসের তালিকা।

আমার কাছে যে পদ্ধতিগুলি সবচেয়ে কাজের মনে হয়েছে সেগুলি হলো : যৌন মিলনের পরে প্রস্রাব করা – দিনে ৪/৫ পাইন্ট (১৬ আউন্স = ১ পাইন্ট) পানি পান করা। তরল পাইন্টগুলি সংক্ষেপে পিটি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ ১ পাইন্ট ১ পিটি হিসাবে লেখা যেতে পারে। পানি পান করা এবং যদি আমি টনটন অনুভব করি তবে সোডা বাইকার্বোনেট গ্রহণ করা। তারা আপনাকে যা বলে তা সত্ত্বেও ক্রানবেরিগুলির জন্য কোনো সত্যতার প্রমাণ নেই।

▲গণস্বাস্থ্য

তথ্যসূত্র :

Cystitis: How bacteria get into your bladder

Jorgensen I, Seed PC (2012) How to Make It in the Urinary Tract: A Tutorial by Escherichia coli. PLoS Pathog 8(10): e1002907. doi:10.1371/journal.ppat.100290

ছবিসূত্র :

North eastern urology, Everyday health, philipine society for nicrobiology and infectious disease

নবীন চিকিৎসকগণ নিজের জ্ঞান পরীক্ষা করুন

এ সংখ্যার ৬ নম্বর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত জ্ঞান পরীক্ষার উত্তর

দম খাটোযুক্ত এক তরুণ : A young man with shortness of breath

সম্ভাব্য রোগ নিরুপণ কী হবে?

- **সেপটিক পালমোনারি এম্বোলাস (Pulmonary embolus)** : সিটি (CT) পালমোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রামে পালমোনারি ধমনিতে ত্রুটি ও সংশ্লিষ্ট সংকুচিত এলাকা, হৃদদ্রুতি (Tachycardia-হৃদস্পন্দন মিনিটে ১০০ বারের বেশি হওয়া), নিম্ন রক্তচাপ, জ্বর (Pyrexia), উত্থিত প্রদাহজনক মার্কার দ্বারা নির্দেশিত।
- **সুপারফিশিয়াল ফিমোরাল ধমনি ও সুপারফিশিয়াল ফিমোরাল শিরার মধ্যে আর্টেরিওভেনাস ফিস্টুলা (Arteriovenous fistula)** : কুঁচকিতে শিহরণ অনুভব করা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে এবং সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম সন্নিহিত পার্থক্য প্রদর্শন করছে।
- **বাম উর্বস্থি শিরায় (Femoral artery) তীব্র সেপটিক তঞ্চনরোধ (Septic deep vein thrombosis)** : সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রামে সন্নিহিত পার্থক্য ও শিরার অধঃস্তন অংশের বাম দিকে বর্ধিত প্রসারণ দিয়ে নির্দেশিত; রক্তপ্রবাহে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতির দিক থেকে বলা যায় একই অংশে সম্ভবত ব্যাকটেরিয়ার সূত্রপাত ঘটেছে।

এছাড়া ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী রোগীদের ক্ষেত্রে সংক্রামক হৃদঅন্তরাস্তরপ্রদাহ বা এন্ডোকার্ডাইটিস (Endocarditis) গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

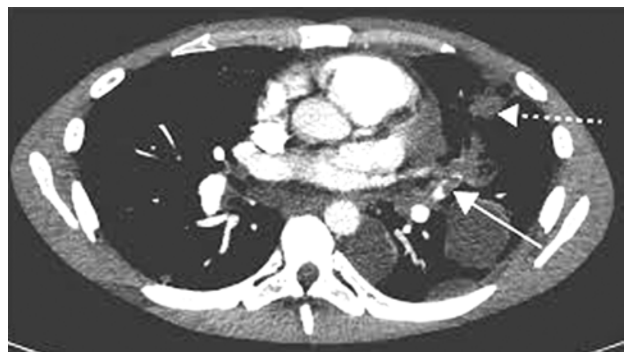

Fig-1: Computed tomography pulmonary angiogram in axial view showing left lower lobe lateral segmental pulmonary artery filling defect (white arrow). Broken white arrow shows multiple round areas of consolidation.

Fig-2: Computed tomography angiogram of the inguinal region in axial view at the level of the orogin of the superficial femoral artery. Contiguous vessels and contrast (white arrow) and (black arrow) are seen. Dilated enhancing left iliac veins (much larger than those on the right) can also be seen (broken black arrow).

শিক্ষণীয় বিষয় :

- যেসব রোগী অবৈধভাবে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করেন তাদের গভীর শিরার তীব্র তঞ্চনরোধ (Deep vein thrombosis), এম্বোলি, শিরায় তীব্র সেপটিক থ্রম্বোসিস ও এম্বোলি (Emboli), আর্টেরিও নোস ফিস্টুলা এবং সংক্রামক হৃদঅন্তরাস্তরপ্রদাহ বা এন্ডোকার্ডাইটিস (Endocarditis)-এর ঝুঁকি রয়েছে।
- ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক প্রয়োগের স্থান হিসেবে বৃহৎ প্রমিক্সাল শিরা (Promixal vein) ব্যবহৃত হলে শিরায় তীব্র সেপটিক থ্রম্বোসিস হতে পারে;
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ কারণসূচক ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে *S. aureus*।

British Medical Journal, 12 June 2021

সঠিক মূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বাংলাদেশে আমরাই

প্রথম এবং পথিকৃত

গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ লিমিটেড কর্তৃক উৎপাদিত ইনজেকশনসমূহ :

Sl. No.	Branded Generic Name	Pack size	MRP (with VAT) ৳:
1	G-Ceftriax Injection (Ceftriaxone Sodium USP)	2gm IV	170.00 per vial
2	G-Ceftriax Injection (Ceftriaxone Sodium USP)	1gm IV & IM	120.00 per vial
3	G-Ceftriax Injection (Ceftriaxone Sodium USP)	500mg IV & IM	80.00 per vial
4	G-Ceftriax Injection (Ceftriaxone Sodium USP)	250mg IV & IM	50.00 per vial
5	G-Gentamicin Injection 80mg/2ml (Gentamicin Sulphate BP)	2ml x 10	12.00 per amp
6	G-Metronidazole Infusion 500mg (Metronidazole BP)	100ml	40.00 per bottle
7	G-Atropine Injection 0.6mg/ml (Atropine Sulphate BP)	1mlx10	5.00 per amp
8	G-Diazepam Injection 10mg (Diazepam BP)	2mlx10	3.70 per amp
9	G-Cipro IV Infusion (Ciprofloxacin Lactate USP)	100ml	50.00 per vial
10	G-Dexamethasone Injection 4 mg (Dexamethasone Sodium Phosphate BP)	1mlx10	15.00 per amp
11	G-Diclofenac Injection 75mg/3ml (Diclofenac Sodium BP)	3mlx5	15.00 per amp
12	G-Ergometrine Injection 0.2mg/1ml (Ergometrine Maleate BP)	1mlx5	7.45 per amp
13	G-Ephedrine Injection 5mg/ml (Ephedrine Hydrochloride BP)	5mlx5	25.00 per amp
14	G-Ferric Injection 500mg/10ml (Ferric Carboxymaltose INN)	10ml	400.00 per vial
15	G-Furosemide Injection 20mg/2ml (Furosemide BP)	2mlx10	8.00 per amp
16	G-Ketamine Injection 50mg/ml (Ketamine Hcl USP)	10ml	97.00 per vial

Sl. No.	Branded Generic Name	Pack size	MRP (with VAT) ৳:
17	G-Mag Sulph Inj. 40gm/100 ml (Magnesium Sulphate 7H_2O BP)	100ml	50.00 per vial
18	G-Mag Sulph Inj. 2.47gm/ 5ml (Magnesium Sulphate 7H_2O BP)	5mlx5	20.00 per amp
19	G-Morphine Injection 15mg/ml (Morphine Sulphate BP)	1mlx5	40.00 per amp
20	G-Neostigmine Inj. 105gm/ml (Neostigmine Methyl Sulphate BP)	1mlx5	10.00 per amp
21	G-Pethidine Injection 100mg/2ml (Pethidine Hydrochloride BP)	2mlx5	34.50 per amp
22	G-Thiopental Injection (Thiopental Sodium BP)	500mg	60.00 per vial
23	G-Thiopental Injection (Thiopental Sodium BP)	1g	100.00 per vial
24	G-Meropenem Injection 1gm (Meropenem USP)	1gm	400.00 per vial
25	G-Vancomycin Inj. 1g (Vancomycin Hydrochloride USP)	1g	200.00 per vial
26	G-Vancomycin Inj. 500mg (Vancomycin Hydrochloride USP)	500mg	125.00 per vial
27	G-Lidocaine Injection 2% (Lidocaine Hydrochloride BP 20mg)	50ml	25.00 per vial
28	G-Lidocaine 2% with Adrenaline (Lidocaine Hydrochloride BP 20mg + Adrenaline 10 microgram as Adrenaline Acid Tartrate BP)	50ml	57.00 per vial
29	G-Omeprazole Injection Omeprazole Sodium (Sterile) BP Equivalent to 40 mg Omeprazole	40mg	50.00 per vial
30	G-Bupivacaine Inj. HEAVY (Bupivacaine Hydrochloride USP 5mg Dextrose Anhydrous USP 80mg)	4ml x 5	30.00 per amp

We Serve People & Ensure Quality

দেশের স্বাস্থ্যের জন্যে

গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ লিমিটেড

সুলভ মূল্যে আন্তর্জাতিক মানের ওষুধ উৎপাদনই আমাদের বৈশিষ্ট্য